ক্রুসেড বিশ্বকোষ-৫

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

ক্রুসেড বিশ্বকোষ-৫

মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

ভাষান্তর : যায়েদ আলতাফ

সম্পাদক : ইমরান রাইহান

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০২৩
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২১

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৬৩০, US $ 20, UK £ 17

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96590-2-0

Mongol o Tatarder Etihas ১ম
by Dr. Ali Muhammad Sallabi

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অর্পণ

আল্লাহর দিনকে যারা প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ী করতে চায়, সে-সকল মুসলিমকে।

মহান আল্লাহর কাছে তাঁর উত্তম নামসমূহ ও সুমহান গুণাবলির অসিলায় প্রার্থনা করছি, তিনি যেন গ্রন্থটিকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন।

পবিত্র কুরআনের ভাষায়—'সুতরাং যে তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।' [সূরা কাহাফ : ১১০]

আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস সাল্লাবি

প্রকাশকের কথা

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে গোবির তৃণহীন মরুভূমি থেকে আকাশ আঁধার করে আসা সর্বনাশা ঝড়ের কালো ছায়া পড়েছিল শক্তিশালী খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ও উম্মাহর ঐক্যের কেন্দ্র বাগদাদে স্থিত আব্বাসি খিলাফতের ওপর। কিন্তু বিতর্কপ্রিয় অচেতন জনগোষ্ঠীর কেউই তেমন গুরুত্ব দেয়নি সে দিন। সতর্ক হয়নি সে ঝড় থেকে আত্মরক্ষার জন্য। একসময় সেই ঝড় প্রচণ্ড আকার ধরে আছড়ে পড়ে খাওয়ারিজমের ওপর এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে শক্তিমান ও সমৃদ্ধ এই সাম্রাজ্য; কিন্তু খাওয়ারিজমের করুণ অবস্থা দেখেও সতর্ক হওয়ার গরজ অনুভব করেনি পাশের বাগদাদ। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়। মোঙ্গল ও তাতার নামক সেই প্রলয়ংকরী তাণ্ডবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিশাল খিলাফতে আব্বাসিয়া। মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ত্রাস, শঙ্কা আর উৎকণ্ঠা। রক্তের স্রোতে তলিয়ে যেতে থাকে দারুল খিলাফা বাগদাদ। ফেলে দেওয়া গ্রন্থের কালিতে কালো হয়ে যায় দিজলা ও ফুরাত। জীবিতরা আশ্রয়ের খোঁজে পালাতে থাকে মিসরের দিকে—মামলুক সুলতানের আশ্রয়ে।

মানুষ মনে করেই নিয়েছিল, তাতারঝড় একটা খোদায়ি গজব; কিয়ামতপূর্ব ইয়াজুজ-মাজুজের বাহিনী। কেউ কেউ ভাবছিল এরা দাজ্জালের বাহিনী; তাই মানুষের সাধ্য নেই এই ঝড়ের মোকাবিলার। মুসলিমবিশ্বের ওপর বয়ে যাওয়া এ তাণ্ডব দেখে সেদিন থরথর করে কাঁপছিল ইউরোপও। হ্যারল্ড ল্যাম্বের ভাষায়, 'সুইডেন আর ভেনিসের জেলেরা তাতারদের ভয়ে সাগরে মাছ ধরার নৌকা ভাসাতে ভয় পেত!'

জাতিকে রক্ষার জন্য তখন প্রয়োজন ছিল এমন একজন নেতার, যার মধ্যে থাকবে জিহাদের পূর্ণ জজবা। তার ইমান হবে পাথরের চেয়ে কঠিন ও দৃঢ়, সাহস থাকবে পাহাড়ের চেয়ে উঁচু; আর জাতির প্রতি প্রেম ও দরদে হৃদয়টা থাকবে সাগরের চেয়ে বিশাল ও গভীর। সেই ক্রান্তিকালে মহান আল্লাহ মামলুক সুলতানদের থেকে বাছাই করে নিয়েছিলেন সাইফুদ্দিন কুতুজ নামের এক মুজাহিদকে, যিনি ইমান ও জিহাদের মাঠে আবির্ভূত হয়েছিলেন ধূমকেতুর গতি নিয়ে। আইন জালুতের মহারণে চির-অজেয় আখ্যা পাওয়া তাতারদের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিয়ে উম্মাহর স্বপ্নের আকাশে উদিত হয়েছিলেন ধ্রুবতারা হয়ে। পালটে দেন ইতিহাসের মোড়। ধীরে ধীরে ফিরে আসতে থাকে মুসলমানদের গৌরবময় হারানো অতীত।

ইতিহাসকে তুলনা করা হয় আয়নার সঙ্গে। ইতিহাসের পাতায় দেখে নিতে হয় অতীতের উত্থানের কারণ, পতনের প্রধান নিয়ামক। জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে অনুসরণ করতে হয় সেই উত্থানের মাধ্যমগুলোর এবং পরাজয় থেকে বাঁচতে হলে পরিহার করতে হয় পতনের কারণসমূহ। এমনই এক ইতিহাস হচ্ছে মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস আর মামলুকদের উত্থান।

মানবতার সেই ট্রাজেডি আর উত্থান নিয়ে যুগের বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি লিখেছেন গবেষণাধর্মী অনবদ্য এক ইতিহাসগ্রন্থ। গ্রন্থটি অনূদিত হয়ে আমাদের প্রকাশিত ইতিহাসের গ্রন্থতালিকায় এবার সংযোজিত হলো *মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস* নামে। এটি ড. সাল্লাবির 'ক্রুসেড বিশ্বকোষ' সিরিজের পঞ্চম সিরিজ।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি যথেষ্ট কঠিন আর দুর্বোধ্য। এই দুঃসাধ্য কাজটি করেছেন যায়েদ আলতাফ। যথেষ্ট সাবলীলভাবে তিনি প্রথম খণ্ডের অনুবাদ করেছেন। ড. সাল্লাবির অনুকরণে *সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ : দ্য ব্যাটালিয়ন* নামে গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড আগেই প্রকাশিত হয়েছে। এখন থেকে দ্বিতীয় খণ্ডটি *মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড) নামেও পরিচিত হবে। আর এখন আপনাদের হাতে তুলে দিলাম গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড—*মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস* নামে।

যায়েদ আলতাফ অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় কিছু টীকা সংযোজন করে ফাইল জমা দিলে প্রুফের প্রাথমিক কাজ করেন মুতিউল মুরসালিন। এরপর গ্রন্থটির তথ্যগুলোর বিশুদ্ধতা যাচাই করতে এবং প্রয়োজনে সংযোজন-বিয়োজন করতে ইমরান রাইহান দায়িত্ব নেন। এর কারণ হলো, ইতিমধ্যে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, গ্রন্থটির বিভিন্ন নামের উচ্চারণে ভুল আছে, তথ্যে বিভ্রাট আছে এবং প্রায় নাম—উৎসগ্রন্থ, লেখক, স্থান ইত্যাদি—লেখক এত সংক্ষিপ্তভাবে বা ইশারায় লিখেছেন যে, বাংলাভাষী পাঠক-গবেষকদের কাছে অনেক বিষয় অস্পষ্ট থেকে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

যাইহোক, ইমরান রাইহান বেশকিছু জায়গা চিহ্নিত করেন, যেগুলোতে সংযোজন-বিয়োজন বা প্রয়োজনীয় টীকা লাগিয়ে দেওয়া দরকার। এদিকে একটা মৌলিক গ্রন্থে এরকম সংযোজন-বিয়োজন কতটা নৈতিকতার পর্যায়ে পড়ে, সে প্রশ্নও সামনে আসে। এই হিসেবে ইমরান ভাইয়ের পরামর্শে মূল লেখককে বিষয়টি অবগত করি যে, 'গ্রন্থটির অনুবাদে আমরা সংযোজন-বিয়োজন করতে চাই।' লেখক খুশি হয়ে আমাদের অনুমতি দেন। এবার আমি আর ইমরান ভাই শুরু করি সংযোজন-বিয়োজনের কাজ। দীর্ঘ সময় নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ কাজটি সমাপ্ত করি। এরপর অনুবাদক বিভিন্ন নামের ইংরেজি সংযোজন করে দেন ব্র্যাকেটের মধ্যে। পরে আবদুল্লাহ আরাফাত প্রায় দুই মাস রাতদিন একাকার করে প্রতিটি ইংরেজি বানান ও উচ্চারণের বিশুদ্ধতা যাচাই করে দেন।

যে কথাটি আবারও বলছি, গ্রন্থে ব্যক্তি বা জায়গার নামগুলো বেশ কঠিন ও দুর্বোধ্য। আমরা এখানে প্রত্যেকটি নামের সঠিক বানান খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি এবং বিভিন্ন রেফারেন্স ও ইতিহাসের গ্রন্থাদি ঘেঁটে অধিকাংশ নামের শুদ্ধরূপটা খুঁজে বেরও করেছি। তবে বিপত্তিটা বাধে উচ্চারণের ক্ষেত্রে। মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাসের নামগুলো হয়তো মঙ্গোলিয়ান ভাষায় বা চীনা ভাষায় অথবা তাদের কোনো উপজাতীয় ভাষায়, যার সঠিক উচ্চারণ আমাদের জন্য বের করাও কষ্টকর; ভাষার দুর্বোধ্যতা ও ভাষাগুলো আমরা না জানার কারণে। এই হিসেবেও আমাদের কাজে ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

টীকার ব্যাপারে একটা বিষয় স্পষ্ট করা দরকার মনে করছি; আর সেটি হচ্ছে, রেফারেন্সগ্রন্থ আর পৃষ্ঠানম্বর পাশাপাশি একই হলে প্রথমটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয়টি রেখেছি। গ্রন্থটি যেহেতু দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, তাই মূল গ্রন্থের ভূমিকাও আমরা উভয় খণ্ডে ভাগ করে দিয়েছি। কলেবর আর বাহুল্য বিবেচনায় সাইফুদ্দিন কুতুজ গ্রন্থের ভূমিকা এই খণ্ডে রাখিনি, যেহেতু এটি দ্বিতীয় খণ্ডে আছে।

যাইহোক, এত এত মানুষের রাতদিনের পরিশ্রমের পরও আমরা আমাদের কাজকে শতভাগ বিশুদ্ধ দাবি করতে পারি না। যেকোনো ধরনের ভুল হতে পারে, থেকে যেতে পারে। মানুষ হিসেবে আমরা অপারগতা আর দুর্বলতা স্বীকার করছি। তবে আমরা আমাদের চেষ্টায় যে কোনো ত্রুটি করিনি, আশা করি সেটা আপনাদের বোঝাতে পেরেছি। কিন্তু কতটুকু সফল হয়েছি, সেই বিচারের ভার আপনাদের ওপরই ছেড়ে দিলাম।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
১০ সেপ্টেম্বর ২০২১

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর, যিনি আমাদের ইমান ও ইসলামের দৌলত দান করেছেন, তাওহিদ ও রিসালাতের অনুসারী বানিয়েছেন। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসুলে আরাবি ﷺ-এর ওপর, যিনি অন্ধকার থেকে আলোর পথে আমাদের বের করে এনেছেন। তাঁর মহান সাহাবি ও তাবিয়িগণের ওপরও রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস মূলত বিশ্বখ্যাত ইসলামি ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির *দাওলাতুল মুগুল ওয়াত তাতার বাইনাল ইনতিশার ওয়াল ইনকিসার* গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। এটি 'ক্রুসেড বিশ্বকোষ সিরিজ'-এর পঞ্চম গ্রন্থ। মূল আরবি গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে সাজদায়ে শোকর আদায় করছি।

একাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শুরু, তারপর ৩০০ বছরেরও বেশি সময় মুসলিমবিশ্বের পূর্বাঞ্চল বহিঃশত্রুর এমন ভয়াবহ বিপদ ও আগ্রাসনের শিকার হয়েছে, যার ফলে ইসলামি সভ্যতা ও মুসলিম জনপদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পশ্চিমের খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা প্রথম বড় বিপদ হয়ে দেখা দেয়। তারা আরববিশ্বের ইনতাকিয়া, বায়তুল মাকদিসসহ অন্যান্য অঞ্চল দখল করে সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। মুসলমানরা এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করে দ্রুত তাদের প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেন। তারপর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে হিত্তিনের যুদ্ধে ক্রুসেডারদের ওপর এক ভয়াবহ আক্রমণ চালিয়ে তাদের হাত থেকে বায়তুল মাকদিসসহ বেশ কিছু কেল্লা ও দুর্গ ছিনিয়ে নিয়ে আসেন। তবে তখনো কিছু অঞ্চল তাদের দখলে থেকে যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে মিসর মুসলমানদের প্রতিরোধযুদ্ধের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ক্রুসেডাররাও মিসর দখলের চেষ্টা করতে থাকে।

ইতিহাসের ঠিক এই সময়ে এসে মুসলমানদের ওপর আরেক মহাবিপদ নেমে এসে। এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে মোঙ্গলরা আত্মপ্রকাশ করে। তারা ছিল মুসলমানদের জন্য 'খোদার গজব' স্বরূপ। চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে তারা একের পর এক রাষ্ট্র দখল করতে থাকে।

চীন, মধ্য এশিয়া ও মুসলমানদের খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য তারা জয় করে ফেলে। এশিয়া মাইনরে সেলজুক সাম্রাজ্যও তাদের হাতে চলে যায়। তারপর তারা ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে অভিযান চালায়। ইরানে ইলখানি শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

মুসলমানরা যদি ঘুমিয়ে না থাকত, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ভাই ভাইয়ের রক্তপাত ঘটিয়ে অচেতন হয়ে পড়ে না থাকত, তাহলে মোঙ্গলরা এত দ্রুত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারত না। খ্রিষ্টানদের পক্ষে অবশ্য মোঙ্গলঝড়ের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। তাই তারা গিয়ে তাদের সঙ্গে হাত মেলায়। হালাকু খান তাদের সঙ্গে নিয়েই মুসলমানদের ধ্বংসের ষোলোকলা পূর্ণ করে। বাগদাদের আব্বাসি খিলাফতের পতন ঘটায়।

ইতিহাসের পাতায় যদিও মোঙ্গলরা বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, তবে এ ক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের সমপর্যায়ের ছিল না। কেননা, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মুসলিমরা দুর্বল হয়ে পড়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মুসলিম অঞ্চল পদানত করতে মোঙ্গলদের ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকতা ছিল তাদের মূল অস্ত্র। এটি তাদের রক্তে মেশা ছিল। তারা মূলত ছিল কাপুরুষের জাতি। কোনো অঞ্চলের সঙ্গে নিরাপত্তাচুক্তি করে সেখানে প্রবেশ করত, তারপর তা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিত। যারা আত্মসমর্পণ করত, তাদেরও তারা হত্যা করত।

খ্রিষ্টানরা এই বর্বরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে মুসলমানদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। তাদের সেই স্বপ্ন যখন পূরণ হতে চলছিল, ঠিক তখনই মিসরের মামলুকরা তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে আইন জালুতের যুদ্ধে এই মামলুকদের কাছেই মোঙ্গলরা এমন মার খায় যে, পরে তারা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। তাদের কোমর ভেঙে যায়।

হিজরি ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী মোতাবেক খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে, এই বর্বর মোঙ্গল ও তাতারদের বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিমবিশ্বের ওপর দিয়ে বইয়ে দেওয়া তাদের ধ্বংসাত্মক ঝড়।

কোনো সভ্য দেশ ও জাতির ওপর অসভ্যদের হামলে পড়া যদিও অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে একটি অসভ্য জাতির স্বল্প সময়ে এত বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলা এবং তা গড়তে গিয়ে বহু জনপদ, দেশ, রাষ্ট্র ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা সত্যিই অস্বাভাবিক। শুধু অস্বাভাবিক নয়, রহস্যেরও। কত বড় বড় সেনাপতির আগমন ঘটল, যাদের গ্রেট উপাধি দেওয়া হয়েছিল, তারা কেউ যা পারেনি; মূর্খ ও বর্বর চেঙ্গিস খানের পক্ষে তা কীভাবে সম্ভব হলো! সে কীভাবে চীন, ইরান, মা-ওয়ারাউন নাহার, এশিয়া মাইনর ও পূর্ব ইউরোপ জুড়ে বিস্তৃত বিশাল এক সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করল? মুসলমানরা তখন কী করছিল? হাজার হাজার মাইলের ইসলামি সাম্রাজ্যে তাদের মোকাবিলা করার মতো একজন লৌহমানবও

কি ছিল না? বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে লেখক অত্যন্ত নির্মোহভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা এবং মোঙ্গলদের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

এবার গ্রন্থের অনুবাদ প্রসঙ্গে আসি। আমার কাছে মনে হয়েছে ইতিহাসের অন্য যেকোনো গ্রন্থের চেয়ে মোঙ্গলদের ইতিহাসগ্রন্থ অনুবাদ করা দুরূহ ও কষ্টসাধ্য। এর পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে, তাদের ইতিহাস, ভাষা ও অঞ্চল সম্পর্কে আমার তেমন জানাশোনা না থাকা। সেই সঙ্গে তাদের সঠিক ইতিহাস নিয়ে রচিত গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছেই। এ জন্য মূল গ্রন্থে উল্লেখিত বিভিন্ন গোত্র, জাতি, অঞ্চল ও দেশের নাম বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণে তুলে আনতে গলদঘর্ম হতে হয়েছে। মূল অনুবাদের পাশাপাশি এগুলোর পেছনেও যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে।

বিদেশি ভাষার মধ্যে যেহেতু আমার শুধু আরবি, ইংরেজি ও উরদুটা জানা, তাই এসব ভাষায় মোঙ্গল ও তাতারদের ওপর রচিত গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করে অনেক তথ্য নিরীক্ষণ করতে হয়েছে। মানচিত্র সামনে রাখতে হয়েছে। তারপর কালান্তরের সম্পাদনা-পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে সঠিকটা নির্বাচন করতে হয়েছে। বিশেষ করে আবদুল্লাহ আরাফাত ভাইয়ের কথা না বললেই নয়। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। অনেক ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তার জীবনকে নির্ভুল করে দিন।

ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি, সাম্রাজ্য, স্থান, অঞ্চল, নদী, পর্বত, দুর্গ ও স্থানের বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ উল্লেখ করার পাশাপাশি টীকায় সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে; যাতে পাঠকের জ্ঞানসত্তা একটু হলেও পরিতৃপ্ত হয়। কেউ অধিক পরিতৃপ্ত হতে চাইলে তার জন্য ইংরেজি শব্দটা দিয়ে ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে দেখার সুযোগ রয়েছে।

অনুবাদে যাতে কোনো অংশ বাদ না পড়ে, সেদিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। কিছু স্থানে লেখকের বক্তব্য পরিমার্জন করে সঠিকটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে মহাবীর সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজমশাহ সম্পর্কে তাঁর কিছু বক্তব্য। যেহেতু তিনি অনারব ছিলেন, তাই অনেক আরব ইতিহাসবিদ তাঁর প্রতি সুবিচার করেননি। কলমের আঁচড়ে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করার চেষ্টা করেছেন। এই গ্রন্থের লেখকও তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদানে কার্পণ্য করেছেন বলে মনে হলো। তবে সুলতানের যে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে, সেটাও আমরা অস্বীকার করছি না।

কোথাও কোথাও ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করা হয়েছে। শুধু শব্দ ধরে ধরে অনুবাদ না করে এর মর্মে পৌঁছার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কিছু সংযোজন-বিয়োজনও করা হয়েছে। তারপরও আমরা জোর দিয়ে বলতে পারছি না যে, শতভাগ উত্তীর্ণ হতে পেরেছি, সম্পূর্ণ নির্ভুলরূপে গ্রন্থটি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি। আমাদের যারা ভালোবাসেন, কালান্তরকে যারা ভালোবাসেন, সবার কাছে অনুরোধ থাকবে,

আমাদের দুর্বলতাগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আরও পরিমার্জিত সংস্করণ আপনাদের উপহার দেওয়ার সুযোগ দেবেন।

অনুবাদ ও অনুবাদপরবর্তী এই যে এতগুলো ধাপ, এগুলো পার করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না, যদি কালান্তরের প্রকাশক আবুল কালাম আজাদ ভাইয়ের অনুপ্রেরণা ও দিক-নির্দেশনা সঙ্গে না থাকত। আমার জানামতে খুব কম প্রকাশকই আছেন, যারা শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রকাশনী থেকে কোনো গ্রন্থ প্রকাশের আগে গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ পড়ে দেখেন। জায়গায় জায়গায় প্রশ্ন তোলেন। তাঁর এই গ্রন্থসচেতনতা সত্যিই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আশা করি, কালান্তর থেকে প্রকাশিত ড. সাল্লাবির 'ক্রুসেড বিশ্বকোষ সিরিজ'-এর অন্যান্য গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থটিও আপনাদের কাছে প্রত্যাশাতীত সমাদর পাবে। আল্লাহ আমাদের সবার কর্মপ্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

যায়েদ আলতাফ
সাভার, ঢাকা-১৩৪০
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১৯

প্রথম অধ্যায়

মোঙ্গলীয় মিশন ও মুসলিমবিশ্বে মোঙ্গল আগ্রাসন # ২৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

মোঙ্গল ইতিহাসের সূচনা # ২৯

এক : মোঙ্গল-ইতিহাস অধ্যয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ২৯
দুই : মোঙ্গলদের পরিচয় ৩৩
তিন : মোঙ্গলদের আদিবাস ৩৫
চার : যেসব জাতি ও জনগোষ্ঠী মিলে মোঙ্গলসমাজ গঠিত ৩৬
১. তুর্কি জাতিসমূহ ৩৬
২. অ-তুর্কি জাতি ৩৮
পাঁচ : মোঙ্গলদের সামাজিক জীবন ৪১
১. মোঙ্গলদের খাবার ৪৩
২. মোঙ্গলদের পোশাক-পরিচ্ছদ ৪৩
ছয় : মোঙ্গলদের ধর্ম ৪৩
সাত : চেঙ্গিস খানের আবির্ভাবের পূর্বে মোঙ্গলদের সামাজিক অবস্থা ৪৮
১. মঙ্গোলিয়ায় অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ৪৮
২. বিচ্ছিন্ন মোঙ্গল জনগোষ্ঠীগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা ৪৯
আট : মোঙ্গল আগ্রাসনের সময় মুসলিমবিশ্বের অবস্থা ৫১
১. ইসমাইলি বাতিনি ফিরকা ৫৪
২. আব্বাসি খিলাফত ৫৭
৩. মিসর ও শামে আইয়ুবি শাসনের অবস্থা ৫৯
৪. মুসলিম জাহানে ধ্বংসাত্মক পাপাচার ও অবাধ বিকৃতাচার ৬১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চেঙ্গিস খানের আবির্ভাব # ৬৮

এক : জন্ম ও বেড়ে ওঠা ৬৮
১. চেঙ্গিস খানের মায়ের সংগ্রাম ৬৯
২. তেমুজিনের (চেঙ্গিস খানের) চোর দমন ৭০
৩. তেমুজিনের বিয়ে ও কিরায়েত শাসকের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি ৭২
দুই : মোঙ্গালনেতা হিসেবে 'খান' উপাধি ধারণ ৭৩
তিন : নাইমান সাম্রাজ্য এবং তাদের চেঙ্গিস খানের বশ্যতা স্বীকার ৮২
চার : মোঙ্গাল সাম্রাজ্য গঠন ৮৪
পাঁচ : চেঙ্গিস খানের শাসনামলে মোঙ্গালীয় মিশনের উপাদানসমূহ ৮৯
১. চেঙ্গিস খানের ব্যক্তিত্ব ৮৯
২. *আল-ইয়াসা* নামক রাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণয়ন ৯৯
৩. রাজপরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব বণ্টন ১১১
৪. মোঙ্গালদের রণকৌশল ও বিজিতদের সঙ্গে তাদের আচরণ ১২০
৫. অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন ১২৩
৬. একজন চীনা দার্শনিক ১২৪
৭. রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে 'কুরিলতাই' নামে সাধারণসভা ১২৭
৮. মোঙ্গালদের রণকৌশল ও সমরনীতি ১২৯
৯. মোঙ্গালদের সামাজিক ঐতিহ্য, আচার ও রীতিনীতি ১৩২
১০. মোঙ্গালদের বিয়ে ১৩৩
১১. মোঙ্গালদের অলীক বিশ্বাস ১৩৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোঙ্গালদের হাতে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পতন # ১৩৭

এক : খাওয়ারিজমের সুলতানগণ ১৩৭
দুই : খাওয়ারিজম ও আব্বাসি খিলাফতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ১৪০
তিন : খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে মোঙ্গাল আগ্রাসনের কারণ ১৪৩
১. পূর্ব-এশিয়ার মানুষদের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ ১৪৪
২. অব্যাহত যুদ্ধাভিযানের মানসিকতা ১৪৪
৩. খাওয়ারিজমশাহের সঙ্গে চেঙ্গিস খানের বাণিজ্যিক চুক্তি ১৪৫
৪. উভয় সাম্রাজ্যে বণিকদের যাতায়াত ১৪৭
৫. বণিক কাফেলার সদস্যদের হত্যা ও তাদের পণ্যসামগ্রী বাজেয়াপ্তকরণ ১৪৯
৬. সংকট নিরসনে মোঙ্গালদের কূটনৈতিক তৎপরতা ১৫১

চার : মা-ওয়ারাউন নাহার ও অনারব ইরাকে মোঙ্গলদের আগ্রাসন ১৫৪
১. মা-ওয়ারাউন নাহার ১৫৪
২. খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল দখল এবং মুহাম্মাদ খাওয়ারিজমশাহের মৃত্যু ১৬৮
৩. খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ওপর মোঙ্গলদের আধিপত্য ১৭৬
৪. খোরাসান দখল ১৮৩
৫. গজনি (Ghazni) দখল ১৯১
৬. সুলতান জালালুদ্দিনের শেষ পরিণতি ১৯৬
পাঁচ : খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ ২০৬
১. সভ্যতা বিনির্মাণে খাওয়ারিজমিদের ব্যর্থতা ২০৮
২. শাসক ও শাসনব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের ঘৃণা ২০৯
৩. খাওয়ারিজম-পরিবারের আত্মকলহ ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ২১১
৪. দুর্বল সমরনীতি ২১৫
৫. পার্থিব মোহ ও মৃত্যুর প্রতি অনাসক্তি ২১৮
৬. বিভক্তি-বিভাজন ও অন্যায়-অবিচার ২২১
৭. সুলতান আলাউদ্দিন খাওয়ারিজমশাহর মনস্তাত্ত্বিক পরাজয় ২২৭
৮. মাংবুরনির ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ২২৮
৯. আব্বাসি খলিফা নাসির লি-দিনিল্লাহর অদূরদর্শিতা ২২৯
১০. আলিমদের অবমূল্যায়ন ২৩২
১১. মোঙ্গলদের মিশন ২৩২
ছয় : চেঙ্গিস খানের মৃত্যু ২৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

মোঙ্গলদের হাতে বাগদাদের পতন # ২৩৭

চেঙ্গিস খানের শাসকবর্গ # ২৩৯

এক : চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্য বণ্টন ২৩৯
দুই : ওগেদাইকে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অধিপতি নির্বাচন ২৪০
তিন : মুসলিম সাম্রাজ্যে মোঙ্গলদের অব্যাহত আক্রমণ ২৪২
১. চীনের উত্তরাঞ্চল জয় ২৪৬
২. ইউরোপ অভিযান ২৪৭
৩. ওগেদাইয়ের মৃত্যু ২৪৮
৪. ওগেদাইয়ের সংস্কার ও শাসনব্যবস্থা ২৪৯
৫. মুসলিম প্রজাদের সঙ্গে ওগেদাইয়ের আচরণ ২৫০

৬. ওগেদাইপুত্র গুয়ুক খান (৬৪৪-৪৭ হিজরি—১২৪৬-১২৪৯ খ্রিস্টাব্দ) ২৫২
৭. গুয়ুক খানকে মোঙ্গল সম্রাট নির্বাচন ২৫৩
৮. মোঙ্গল সম্রাট হিসেব মোংকে খানের অভিষেক ২৫৬
চার : হালাকুর হাতে শিয়া ইসমাইলিদের বিনাশ ২৬৩
১. ইসমাইলি দুর্গের উত্থান ২৬৪
২. শিয়া ইসমাইলিদের মূলোৎপাটন ২৬৬
পাঁচ : হালাকু খানের বাগদাদ অভিযান ২৬৭
১. বাগদাদ আক্রমণ ২৬৭
২. বাগদাদ অবরোধ ২৭১
৩. সংলাপ প্রচেষ্টা ২৭৩
৪. বাগদাদ দখল ২৭৬
৫. খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহর হত্যাকাণ্ড ২৭৮
৬. সভ্যতার বিনাশ ২৮০
৭. বাগদাদের শাসক হিসেবে মুআইয়িদুদ্দিন আলকামি ২৮৫
৮. ইরাকে হালাকুর ইলখানি শাসন ২৮৬
৯. হালাকুর কাছে শাসক ও প্রশাসকদের আগমন ২৮৯
ছয় : আব্বাসি খিলাফতের পরিসমাপ্তি ও শেষ খলিফা মুসতাসিম ২৯০
সাত : আব্বাসি খিলাফত পতনের প্রধান কারণসমূহ ২৯৩
১. প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের অভাব ২৯৭
২. জিহাদের ফরজ বিধানের প্রতি অনীহা ৩০০
৩. মুসলিমবিশ্বে রাজনৈতিক অনৈক্য ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ৩০২
৪. সামরিক দুর্বলতা ৩০৬
৫. দুর্বল রাষ্ট্রীয় মনোভাব ৩০৮
৬. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকরণ ৩১০
৭. অঙ্গরাষ্ট্রের প্রশাসকদের হীনম্মন্যতা ৩১২
৮. রাজনৈতিক অবক্ষয় ৩১৫
৯. কেন্দ্রীয় শক্তির বিভাজন ৩১৬
১০. ত্রুটিপূর্ণ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ৩১৬
১১. আব্বাসি খিলাফতের পতনে খ্রিস্টানদের ভূমিকা ৩১৮
১২. আব্বাসি খিলাফতের পতনে মুসলমান শাসকদের ভূমিকা ৩১৯
১৩. যোগ্য ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে অযোগ্যকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান ৩২৪
১৪. আলাবিদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ৩২৪
১৫. ভোগবিলাস ৩২৮
১৬. চূড়ান্ত অবক্ষয় ৩৩৬

১৭. অর্থনৈতিক মহাসংকট ৩৩৭
১৮. বাগদাদে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ৩৩৮
১৯. উজির ইবনু আলকামির বিশ্বাসঘাতকতা ৩৩৯
২০. তাতারবাহিনীর রণকৌশল ও মোঙ্গল সাম্রাজ্যের শক্তি ৩৪৯
আট : বাগদাদ পতনের ফল ৩৫০
১. সাহিত্য-সভ্যতা ও চিন্তাশক্তির বিনাশ ৩৫০
২. বাগদাদের অবনমন : খিলাফতের রাজধানী থেকে নগণ্য শহর ৩৫১
৩. জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় স্থবিরতা এবং আরবি ভাষার গুরুত্ব হ্রাস ৩৫১
৪. বাগদাদ পতনে খ্রিষ্টানদের আনন্দ-উল্লাস ৩৫২
৫. কায়রোকে খিলাফতের রাজধানী নির্বাচন ৩৫৩
৬. শিয়া মতবাদের প্রসার ৩৫৪
৭. মুসলিম উম্মাহর নবশক্তির বিস্ফোরণ ৩৫৫
৮. উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম উসমানের জন্ম ৩৫৫
৯. বাগদাদের পতনে কবিদের শোকগাথা ৩৫৬

ভূমিকা

নিঃসন্দেহে সব প্রশংসা কেবল আল্লাহর; আমরা যাঁর গুণকীর্তন করি, যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, যাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর কাছে আত্মার প্রবঞ্চনা ও মন্দ কৃতকর্ম থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

> হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

> হে মানব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি এক ব্যক্তি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাঁর থেকে তাঁর স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাঁদের দুজন থেকে বহু নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। ভয় করো তাঁকে, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাঞ্চা করো; আর সতর্ক থেকো আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। [সুরা নিসা : ১]

> হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭১-৭২]

হে আমার রব, আপনার মহীয়ান সত্তা আর বিশাল সাম্রাজ্যের মর্যাদাতুল্য প্রশংসা। আপনার প্রশংসা, যতক্ষণ-না আপনি সন্তুষ্ট হচ্ছেন। আপনার প্রশংসা, আপনি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায়ও। আপনার প্রশংসা, আপনি সন্তুষ্ট হওয়ার পরও। সুতরাং মহান আল্লাহর মহীয়ান সত্তাতুল্য প্রশংসা। তাঁর পূর্ণতাতুল্য প্রশংসা। মহত্ত্ব ও বড়ত্বতুল্য প্রশংসা।

আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোতে ধারাবাহিকভাবে নবি, খুলাফায়ে রাশিদিন, উমাইয়া

যুগে মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে সংঘটিত ক্রুসেড নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ক্রুসেডকালীন পূর্ব এশিয়ার মোঙ্গলদের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে সেলজুক[১] (Seljuk) ও জিনকি (Zengi) বংশের উত্থান, বীর সিপাহসালার সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এবং চতুর্থ (১২০২-১২০৪ খ্রি.), পঞ্চম (১২১৭-১২২১ খ্রি.), ষষ্ঠ (১২২৮-১২২৯ খ্রি.) ও সপ্তম (১২৪৮-১২৫৪ খ্রি.) ক্রুসেড আক্রমণ-পরবর্তী ইতিহাস বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

মূলত এই গ্রন্থে লাখ লাখ মুসলমানের রক্তপায়ী ও বাগদাদে আব্বাসি খিলাফতের কবর রচনাকারী মোঙ্গলদের উত্থান-পতন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাদের যুদ্ধাভিযানের কথা।

মোট চার অধ্যায়ে সেসব আলোচনা বিন্যস্ত করা হয়েছে।

আসুন সংক্ষিপ্তাকারে জেনে নেওয়া যাক কোন অধ্যায়ে কী কী আলোচনা এসেছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদজুড়ে রয়েছে মুসলিম দেশগুলোয় মোঙ্গলদের আগ্রাসন, তাদের ইতিহাস অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা, জাতি গঠনের মূল উপাদান, বিভিন্ন গোত্রের পরিচয়, আদি নিবাস, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন, চেঙ্গিস খানের আবির্ভাবের সময় তাদের ক্রম অধঃপতন, অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও চেঙ্গিস খান কর্তৃক মোঙ্গল গোত্রগুলোয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা।

তারপর মোঙ্গলদের আগ্রাসন-পূর্ববর্তী মুসলিমবিশ্বের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তখনকার আব্বাসি খিলাফত, মিসর ও শামে আইয়ুবি শাসনব্যবস্থা এবং তাদের মধ্যে পাপাচার ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের বিস্তার—যেমন : গানবাজনা, মদ, জিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চেঙ্গিস খানের আবির্ভাব, জন্ম ও বেড়ে ওঠা, সংসার পরিচালনায় তার মায়ের সংগ্রাম, খানের বিয়ে, মোঙ্গল সম্রাট হিসেবে অভিষেক, 'খান' উপাধি ধারণ, যুদ্ধাভিযান, মোঙ্গল জাতিপুঞ্জকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা ও মোঙ্গল সাম্রাজ্য গঠনবিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

তারপর আলোকপাত করা হয়েছে সেসব উপাদানের ওপর, যেগুলো মোঙ্গলীয় মিশন বাস্তবায়নের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তন্মধ্যে চেঙ্গিস খানের

[১] সেলজুক বা সালজুক সুন্নি মুসলমান সাম্রাজ্য, যারা ১০ শতক থেকে ১৪ শতক পর্যন্ত মধ্য-এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য শাসন করেন। ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে বিশাল এ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন সুলতান তুগরুল বেগ। তিনি জাতিতে তুর্কি ছিলেন। সুলতান মালিকশাহর শাসনামলে এই সাম্রাজ্য অর্ধপৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পেলে সেলজুক সাম্রাজ্য ভেঙে ছোট ছোট রাজ্যে পরিণত হয়। বিস্তারিত জানতে পড়ুন কালান্তর প্রকাশিত ড. আলি সাল্লাবির *সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস*।—সম্পাদক।

জীবনচরিত, তার ব্যক্তিত্ব, বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলি ছিল উল্লেখযোগ্য। যেমন : তার বীরত্ব, সাহসিকতা, বদান্যতা, মহানুভবতা, আত্মমর্যাদা, নিষ্ঠুরতা, পরিবার-পরিজন ও ঘনিষ্ঠজনদের প্রতি আন্তরিকতা, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বোঝা ও সেনাপতিদের নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা ও ইয়াসা (Yasa) নামক রাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণয়ন ইত্যাদি। ইয়াসা সম্পর্কে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদদের অভিমত ও ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ইয়াসা সংবিধান, মোঙ্গল সম্রাটদের বাণী সংরক্ষণ, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বণ্টন, পাশাপাশি সম্রাটের সেবকদের দায়িত্ব বণ্টন এবং সম্রাট কর্তৃক সেনাবাহিনীর বিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এ ছাড়া দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আরও যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন : সেনাবাহিনীর প্রতি চেঙ্গিস খানের উপদেশ ও নির্দেশনা, মোঙ্গালদের রণকৌশল ও যুদ্ধের প্রস্তুতিগ্রহণ, বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসকের যোগাযোগ রক্ষা ও সুষ্ঠু পরিচালনা-পদ্ধতি, মোঙ্গালদের সমরনীতি ও বিজিতদের সঙ্গে তাদের আচরণ, গুপ্তচরবৃত্তির প্রতি গুরুত্বারোপ, রাষ্ট্রের বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের মূল্যায়ন ও তাদের থেকে পরামর্শগ্রহণ, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রতিবছর কুরিলতাই (Kuriltai) নামে সাধারণসভার আয়োজন, সেই সভায় বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ, তারপর তা বাস্তবায়নের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং তাদের উন্নত রণকৌশল। সেই সঙ্গে মোঙ্গালদের সামাজিক আচার, রীতিপ্রথা ও অলীক বিশ্বাসগুলোও উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরিলতাই সভার আলোচনায় নেতৃস্থানীয় সবার উপস্থিতিতে বিভিন্ন মতামত গ্রহণ ও সূক্ষ্ম আলোচনা-পর্যালোচনার ভিত্তিতে নিজেদের লক্ষ্য ও মিশন স্থিরীকরণ এবং তা বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট স্ট্র্যাটেজি ও পরিকল্পনা গ্রহণ—ইত্যাদি বিষয়গুলোও উঠে এসেছে।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় ও শেষ পরিচ্ছেদে মোঙ্গালদের হাতে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পতনের বেদনাবিধুর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সংক্ষেপে খাওয়ারিজমের শাসকদের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। তারপর খাওয়ারিজমি ও আব্বাসি খিলাফতের মধ্যে শত্রুতা, খাওয়ারিজমিদের বিরুদ্ধে মোঙ্গালদের যুদ্ধাভিযানের কারণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর মোঙ্গালদের বিজয়াভিযানের কথা আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, মা-ওয়ারাউন নাহার[১] (Transoxiana) থেকে মোঙ্গালরা যেসব অভিযান পরিচালনা করে

[১] এটি ট্রান্স-অক্সিয়ানা বা ট্রান্স-অক্সানিয়া নামেও পরিচিত। রোমানরা এই নাম দেয়। মা-ওয়ারাউন নাহার হচ্ছে প্রাচীন নাম। মধ্য-এশিয়ার বর্তমান উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, দক্ষিণ কিরগিজিস্তান ও দক্ষিণ-পশ্চিম কাজাখস্তানজুড়ে এটি বিস্তৃত ছিল। এর ভৌগোলিক অবস্থান আমু দরিয়া ও সির দরিয়ার মধ্যখানে। — সম্পাদক।

ওতরার (Otrar), জানদ (Jand), বানাকিত (Banākat)[৩], তাজিকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খুজান্দা (কোকন্দ—Khujand), উজবেকিস্তানের বুখারা (Bukhara) ও সমরকন্দে (Samarkand) আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য থেকে পশ্চিমা অঞ্চলগুলো বিচ্ছিন্ন করেছিল, সেসব অভিযানের ধারাবাহিক বিবরণ ও সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিজমশাহের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে সুলতানের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র জালালুদ্দিন মাংবুরনি[৪] কর্তৃক খাওয়ারিজমি বাহিনীর নেতৃত্বগ্রহণ, মোঙ্গালবাহিনী কর্তৃক খাওয়ারিজম শহর অবরোধ ও তার ওপর আধিপত্য বিস্তার-সংক্রান্ত আলোচনা।

তারপর বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনুল আসির কর্তৃক খাওয়ারিজমের ওপর দিয়ে নরখাদক মোঙ্গালদের আগ্রাসনের দুঃসহ ও হৃদয়বিদারক বর্ণনা, মোঙ্গালবাহিনী কর্তৃক খোরাসানকে (Khorasan) ভয়াল মৃত্যুপুরীতে পরিণত করা, বলখে (Balkh) তাদের আধিপত্য বিস্তার, নাসা দখল ও তার অধিবাসীদের হত্যা, মার্বকে (Merv) মৃত্যুপুরীতে পরিণত করা, নিশাপুরবাসী (Nishapur) থেকে প্রতিশোধগ্রহণ, হেরাত (Herat) পদানত করা, গজনি (Ghazni) দখল, সুলতান জালালুদ্দিন মাংবুরনির শেষ পরিণতি ও তাঁর অন্তর্ধানরহস্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ :

১. সাম্রাজ্যের সর্বত্র ইসলামি শিক্ষা-সভ্যতার প্রবাহ সৃষ্টিতে খাওয়ারিজমিদের ব্যর্থতা।
২. শাসক ও শাসনব্যবস্থার প্রতি গণ-অসন্তোষ।
৩. শাসক-পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব।
৪. খাওয়ারিজমিদের দুর্বল সমরনীতি।
৫. পার্থিব জীবনের মোহ ও মৃত্যুর ভয়।
৬. অনৈক্য ও অবিচার।
৭. মুহাম্মাদ আলাউদ্দিন খাওয়ারিজমের স্বার্থপরতা ও মনস্তাত্ত্বিক পরাজয়।
৮. জালালুদ্দিন মাংবুরনির ব্যক্তিত্বের কিছু ত্রুটি ও দুর্বলতা।
৯. আব্বাসি খলিফা নাসির লি-দিনিল্লাহর অদূরদর্শিতা।

---

[৩] ইংরেজি বানানে এ অঞ্চলের নাম বানাকাত (Banākat)। তবে প্রখ্যাত ভূগোলবিদ ইয়াকুত হামাবির মুজামুল বুলদানে এ অঞ্চলের বানানটি 'বানাকিত' রয়েছে। এখানে সে বানানটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। — সম্পাদক।

[৪] মাংবুরনি (Jalaluddin Mangburni) বানানটি বিভিন্নভাবে লিখতে দেখা যায়। আমরা এ বইয়ে 'মাংবুরনি' বানানে নামটি রেখেছি। — সম্পাদক।

১০. রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে আলিমদের অনুপস্থিতি।

১১. মোঙ্গালীয় মিশন।

সব শেষে চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্বর মোঙ্গলদের হাতে মধ্যযুগের তিলোত্তমা নগরী ও সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যপুরী বাগদাদের পতন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বাগদাদ পতন—এটি এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। অবশ্য এর আগে চেঙ্গিস খানের মৃত্যুপরবর্তী মোঙ্গলদের ধারাবাহিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন : চেঙ্গিস খানের প্রতিনিধি শাসকবর্গ, তাদের মধ্যে তার সাম্রাজ্য বণ্টন, মোঙ্গল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খান হিসেবে চেঙ্গিস খানের তৃতীয় পুত্র ওগেদাইকে (Ogedei Khan) নির্বাচন, মুসলিম দেশগুলোতে মোঙ্গলদের অব্যাহত আক্রমণ, চীন-ইরান ও মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্য জয়, উত্তর-চীন জয়, পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধাভিযান, ওগেদাইয়ের মৃত্যু, তার সংস্কার ও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা, মুসলিম জনসাধারণের সঙ্গে তার আচরণ, তার মৃত্যুর পর মোঙ্গল সম্রাট হিসেবে গুয়ুক খানকে (Güyük Khan) নির্বাচন, খ্রিষ্টানদের সঙ্গে গুয়ুকের দহরম-মহরম, তার মৃত্যু, মোংকে খানকে (Möngke Khan) মোঙ্গল সম্রাট হিসেবে নির্বাচন, তার অভ্যন্তরীণ সংস্কার, মোঙ্গল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সঙ্গে তার সমতাপূর্ণ আচরণ, তার সঙ্গে খ্রিষ্টানদের মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মোংকে খান খ্রিষ্টানদের সঙ্গে এই শর্তে মৈত্রীচুক্তি করে যে, মোঙ্গল সম্রাটই হবে বিশ্বের একমাত্র শাসক; বন্ধু রাষ্ট্রগুলো তার অনুগত বিবেচিত হবে, শত্রু রাষ্ট্রগুলোকে সমূলে বিনাশ করা হবে কিংবা বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা হবে।

এরপর শিয়া ইসমাইলিদের জাতিগতভাবে নিধন ও তাদের শিকড় উৎপাটনে হালাকু খানের তৎপরতা এবং বাগদাদ অভিমুখে মোঙ্গলবাহিনীর অভিযান পরিচালনা, বাগদাদ অবরোধ ও দখল, খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহকে হত্যা, সভ্যতার বিনাশ, তাতারদের হাতে বাগদাদের সুবিশাল গ্রন্থাগার জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

বাগদাদ পতনের পর ইরাকে হালাকু খানের ইলখানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ জুওয়াইনির যুগে ইরাকের প্রশাসন, হালাকু খানের কাছে শাসক ও প্রশাসকদের আগমনের বর্ণনাও বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এরপর ইতিহাসের ঘটনাবহুল অধ্যায় আব্বাসি সালতানাতের পতনের মৌলিক কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে; যেসব কারণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো ছিল :

১. প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের অভাব।
২. জিহাদবিমুখতা।
৩. রাজনৈতিক অনৈক্য।
৪. আব্বাসি সেনাবাহিনীর দুর্বলতা।
৫. দুর্বল রাষ্ট্রীয় মনোভাব।
৬. অঙ্গীকার ভঙ্গকরণ।
৭. মুসলমান শাসকদের দুর্বলতা ও হীনম্মন্যতা।
৮. রাজনৈতিক অবক্ষয়।
৯. কেন্দ্রীয় শক্তির বিভাজন।
১০. ত্রুটিপূর্ণ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা।
১১. আব্বাসি খিলাফতের পতনে খ্রিষ্টানদের ভূমিকা।
১২. আব্বাসি খিলাফতের পতনে মুসলিম শাসকদের ভূমিকা।
১৩. যোগ্য ব্যক্তির পরিবর্তে অযোগ্যকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান।
১৪. আলাবিদের (আলি-বংশীয়দের) মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।
১৫. ভোগবিলাসিতা।
১৬. চূড়ান্ত অবক্ষয়।
১৭. অর্থনৈতিক মহা সংকট।
১৮. বাগদাদে শাসকদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত।
১৯. শিয়া উজির ইবনু আলকামির বিশ্বাসঘাতকতা।
২০. তাতারদের অভিজ্ঞ ও দুর্ধর্ষ অশ্বারোহীবাহিনী ও মোঙ্গাল সাম্রাজ্যের শক্তি।

এরপর বাগদাদ পতনের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে :

১. ইসলামি সাহিত্য, সভ্যতা ও চিন্তাশক্তির বিনাশ।
২. রাজধানী থেকে বাগদাদের সাধারণ শহরের পর্যায়ে নেমে আসা।
৩. জ্ঞানবিজ্ঞানের অধঃপতন ও আরবি ভাষার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলা।
৪. খ্রিষ্টানদের বিজয়োল্লাস।
৫. কায়রোকে খিলাফতের রাজধানী হিসেবে নির্বাচন।
৬. শিয়াদের বিস্তার লাভ।
৭. মুসলিম উম্মাহর শক্তির বিস্ফোরণ ও তাদের ঘুরে দাঁড়ানো।

এসব ঘটনা মুসলমানদের হৃদয়ে গভীর মর্মজ্বালা সৃষ্টি করেছিল। হতাশা, অনুতাপ ও মনস্তাপের অনলে পুড়িয়েছিল তাদের। কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় সেসব মর্মযাতনা করুণরূপে ফুটে ওঠে। শত শত বছরের সাধনায় মুসলমানরা যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, তার এমন সকরুণ পতন দেখে তারা তাদের ধরে রাখতে পারেননি। ফলে তারা নিজেদের অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। অসংখ্য শোকগাথা রচনা করেন। এসব শোকগাথায় তাদের অন্তর্যাতনা, হতাশা ও দুঃখবোধের কথা করুণ সুর হয়ে বাজে। কুফার বিখ্যাত কবি শামসুদ্দিন এমনই একটি শোকগাথা রচনা করেন। তিনি বলেন,

তোমাদের বিচ্ছেদে আমি সত্যিই মর্মাহত।
জানি না আর কতকাল তোমাদের কারণে আমাকে তিরস্কার
ও ভর্ৎসনার শিকার হতে হবে।

এর তিনটি পঙ্‌ক্তির পর তিনি বলেন,

আমার মতো তুমিও যদি প্রিয়জনদের হারিয়ে থাকো;
কিংবা তোমার হৃদয়েও যদি প্রেমযাতনা সৃষ্টি হয়ে থাকে,
তাহলে পরিত্যক্ত এই জনপদে দাঁড়িয়ে জনপদকে সম্বোধন করে বলো,
হে জনপদ, কালের দুর্যোগ তোমার এ কী হাল করেছে!

শেষ পঙ্‌ক্তিতে তিনি বলেন,

আল্লাহর শপথ, এই বিচ্ছেদ আমি স্বেচ্ছায় বরণ করিনি;
বরং কাল আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রচনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে ১৪৩০ হিজরির ২৮ মুহাররাম—২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি রবিবার রাত ৮টা ১০ মিনিটে, ইশার সালাতের পর। গ্রন্থ রচনার এই শেষ পর্যায়ে এসে আমি আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করছি। তিনি যেন আমার এ কাজটুকু কবুল করে নেন এবং তাঁর বান্দাদের বক্ষকে উন্মুক্ত করেন, যাতে তারা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে এবং আপন দয়া, অনুগ্রহ ও মহানুভবতায় এতে বরকত দান করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

> আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করতে চাইলে কেউ তা নিবারণকারী নেই এবং কোনো অনুগ্রহ রুদ্ধ করতে চাইলে কেউ তা উন্মুক্তকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। [সুরা ফাতির : ২]

আমি আমার মহান স্রষ্টা ও প্রভুর সামনে বিনয়াবনত চিত্তে দাঁড়িয়ে তাঁর অনুগ্রহ, বদান্যতা ও মহানুভবতার কথা স্বীকার করছি। আমার কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই। আমি আমার তৎপরতা, স্থবিরতা ও জীবন-মৃত্যুর সর্বক্ষেত্রে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করছি। আমার

মহান স্রষ্টা আল্লাহই আমার ওপর অনুগ্রহকারী। তিনিই আমাকে সাহায্যকারী। আমার মহান ইলাহই আমাকে তাওফিক দানকারী। তিনি যদি আমার থেকে দূরে সরে যান এবং আমাকে আমার জ্ঞানবুদ্ধি ও নাফসের হাতে সোপর্দ করেন, তাহলে আমার বিদ্যাবুদ্ধি সব নষ্ট হয়ে যাবে, স্মৃতিভ্রষ্ট হবে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় হয়ে পড়বে, অনুভূতিশক্তি হারিয়ে যাবে, আমি আবেগশূন্য হয়ে পড়ব এবং আমার কলম তার লেখার শক্তি হারাবে।

আল্লাহ, আমাকে কেবল আপনার সন্তোষজনক বিষয় দেখান এবং সে জন্য আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করুন। হে আল্লাহ, আমাকে আপনার অপছন্দনীয় বিষয় থেকে দূরে রাখুন। শুধু আমাকে নয়, আমার চিন্তাশক্তি ও অন্তরকেও সেগুলো থেকে দূরে রাখুন। আমি আপনার সমুচ্চ গুণাবলি ও উত্তম নামসমূহের অসিলায় আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার এ কাজটি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে কবুল করুন, আপনার বান্দাদের জন্য এটিকে উপকারী বানান, আমাকে এর প্রতিটি বর্ণের বিনিময় দান করুন এবং এর মাধ্যমে আমার নেকির পাল্লা ভারী করুন। সর্বোপরি যে-সকল ভাইবন্ধু কাজটি শেষ করতে আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, যারা না থাকলে এটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না, তাদের সবাইকে আপনি উত্তম প্রতিদান দিন।

যারা গ্রন্থটি অধ্যয়ন করবেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমার প্রত্যাশা, তারা মহান আল্লাহর কাছে রহমত, মাগফিরাত ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করার সময় আমাকেও তাদের দুআয় অন্তর্ভুক্ত রাখবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

> হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে আপনার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের তাওফিক দিন, যা আপনি আমার পিতা-মাতা ও আমাকে দান করেছেন এবং আমাকে আপনার পছন্দমতো নেক আমল করার তাওফিক দিন। আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। [সূরা নামল : ১৯]

মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ভূমিকা শেষ করছি,

> আল্লাহ, আপনি আমাদের ও পূর্ববর্তী মুমিন ভাইদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের অন্তরে মুমিনদের প্রতি কোনো প্রকার বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। [সূরা হাশর : ১০]

মহান রবের ক্ষমা, করুণা ও সন্তুষ্টির ভিখারি—

আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবি

২৮ মুহাররাম ১৪৩০—২৫ জানুয়ারি ২০০৯

প্রথম অধ্যায়

মোঙ্গালীয় মিশন ও মুসলিমবিশ্বে মোঙ্গাল আগ্রাসন

- মোঙ্গাল ইতিহাসের সূচনা
- চেঙ্গিস খানের আবির্ভাব
- মোঙ্গালদের হাতে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পতন

প্রথম পরিচ্ছেদ

মোঙ্গাল ইতিহাসের সূচনা

এক. মোঙ্গাল-ইতিহাস অধ্যয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দী মোতাবেক খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এশিয়া মহাদেশে যেসব সভ্য জাতির অস্তিত্ব ছিল এবং যাদের ইতিহাসের একটি পর্যায় মোঙ্গাল ইতিহাসের সঙ্গেও জড়িত ছিল, নিঃসন্দেহে একজন ইতিহাসবিদের জন্য সেসব জাতির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করাটা সহজ। কিন্তু একজন ইতিহাসবিদ যখন মোঙ্গালদের প্রকৃত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে যায়; কিংবা একজন ইতিহাস-পাঠক যখন তাদের সম্পর্কে প্রকৃত বিষয় জানতে চায়, সঠিক ইতিহাস অধ্যয়ন করতে চায়, তখন তাকে সত্যিই দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়। অনেক কঠিন সমস্যা ও বাধার মুখোমুখি হতে হয়। কেননা, মোঙ্গালরা ছিল গ্রাম্য ও যাযাবরশ্রেণির মানুষ। তাদের বসবাস ছিল ১৫০০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তীর্ণ এশিয়ার বিখ্যাত গোবি মরুভূমিতে (Gobi Desert); যেখানে উত্তপ্ত বালি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই খাদ্যের সন্ধানে প্রায়ই তাদের জায়গা বদল করতে হতো। প্রতিকূল পরিবেশ ও বৈরী আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হতো। ফলে তাদের জীবনযাত্রা কখনো সুবিন্যস্ত ছিল না। তাই তাদের প্রাথমিক ইতিহাসে ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। সে ইতিহাস এমন অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খল যে, তার ভেতর থেকে বিভিন্ন গোত্র ও উপজাতির মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বের করা অত্যন্ত দুরূহ। অথচ একজন ইতিহাসবিদের জন্য মোঙ্গালদের বিভিন্ন গোত্র ও উপজাতির মধ্যে যে মৈত্রীচুক্তি ছিল, তা জানতে অভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহ ও অব্যাহত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যকার ধারাবাহিকতা খুঁজে বের করা আবশ্যক।

মোঙ্গালদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহে ধারাবাহিকতা না থাকায় এবং সেগুলো সুবিন্যস্ত না হওয়ায় ইতিহাসবিদদের পড়তে হয় বিভ্রান্তিতে। গবেষণা ও অধ্যয়ন অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় বাধা ও প্রতিবন্ধকতা। তা ছাড়া তাদের প্রাথমিক ইতিহাসকে ঘিরে যেসব রহস্য, বিভ্রান্তি ও বানোয়াট কল্পকাহিনির ছড়াছড়ি রয়েছে, তা

সত্যিকারার্থেই তাদের ইতিহাস অধ্যয়ন ও তাদের নিয়ে গবেষণার পথকে রুদ্ধ করে। আর এমনটি মূলত মোঙ্গালদের ওপর লিখিত নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা এবং পূর্ববর্তী ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে গ্রহণযোগ্য তথ্য-উপাত্তের স্বল্পতার কারণে হয়েছে।[৫]

গবেষক ও পাঠকদের জন্য মোঙ্গল ইতিহাস কঠিন হওয়ার আরও একটি কারণ হলো, তাদের আবাসভূমির বিস্তৃতি। তারা বসবাস করত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। মরুচারী যাযাবর হওয়ার কারণে তাদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট কোনো এলাকা ছিল না। এক স্থানে তারা বেশি দিন থাকত না। আঞ্চলিক কোনো সীমানা তারা মানত না। আর সে কারণে তাদের ইতিহাসের ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ করা যায় না। বাধ্য হয়ে তখন একজন গবেষক ও পাঠককে তাদের প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর ঘটনাবলির প্রতি প্রখর অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখতে হয় এবং সেগুলো সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হয়।

তারা ছিল দুঃসাহসী ও দুর্ধর্ষ জাতি। এই দুঃসাহসিকতাই বিস্তীর্ণ মরুভূমি, দুর্গম পাহাড়, উত্তাল নদী, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং ক্ষুধা ও মহামারির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের বেঁচে থাকার শক্তি জুগিয়েছিল। খাবার না থাকলে টানা কয়েক দিন তারা না খেয়ে থাকতে পারত। ঘোড়ায় চড়ে দিনরাত একটানা ছুটতে পারত। উলটো করে বললে বলা যায়, পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতিকূলতাই তাদের দুঃসাহসী করে তুলেছিল। ফলে কোনো বিপদই তাদের কাছে বিপদ মনে হতো না এবং কোনো বাধাকেই তারা বাধা মনে করত না।

তারা ছিল হিংস্র, বর্বর, নিষ্ঠুর ও নৃশংস জাতি। উদারতা, কোমলতা ও দয়ার্দ্রতার কোনো লেশ তাদের অন্তরে ছিল না। তারা নিরক্ষর ও মূর্খ জাতি ছিল। তাই শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কোনো মূল্য তাদের কাছে ছিল না। এসবের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কও ছিল না।

তাদের মন যে দিকে ছুটত, সবাই মিলে সে দিকেই ধাবিত হতো। কত হাজার দুর্গ এবং জনবহুল ও সমৃদ্ধ নগরী মাত্র এক রাতের ব্যবধানে তাদের ভয়াল কালো থাবায় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তার হিসাব কে রেখেছে? তারা রক্ত-আগুনের খেলা খেলে যাওয়ার পর বিভিন্ন শহর ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে একধরনের স্থিরতা ও শান্তভাব বিরাজ করত। বাস্তবে তা এমন কোনো শান্তভাব ছিল না, যা যুদ্ধবিগ্রহ দেখতে দেখতে ক্লান্ত ও নতুন করে সভ্যতার সুফল ভোগ করতে আগ্রহী জাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়; বরং তা ছিল তাদের অন্তিম ও শেষ নিশ্বাস ত্যাগের মুহূর্ত।[৬]

---

[৫] আল-মুগুল, সাইয়েদ বাজ আল আরিনি : ২১।

[৬] প্রাগুক্ত : ২৪।

মোঙ্গল ইতিহাসের প্রতি গবেষকদের আগ্রহের অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, তা খুব বিশদ ও কঠিন। এর জন্য অবশ্য বিস্তর গবেষণা, প্রচুর অধ্যয়ন ও প্রখর অনুসন্ধানী চোখের প্রয়োজন, যা প্রকৃত ইতিহাস-গবেষককে গবেষণায় প্রবৃত্ত হতে আগ্রহী করে তোলে। কেননা, চূড়ান্ত পরিশ্রম করে ইতিহাসের অচেনা-অজানা গলিপথ ঘুরে গবেষণা ও অধ্যয়নের যে প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয় এবং তা থেকে যে ফল আহরণ করা হয়, তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও তৃপ্তিদায়ক হয়।

ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় যে, মোঙ্গলরা রাশিয়া, হাঙ্গেরি ও সাইলেশিয়ায় (Silesia) আক্রমণ করে। ইউরোপেও একাধিকবার আক্রমণ করে। যেহেতু খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের সঙ্গে ক্রুসেডে লিপ্ত ছিল; আর গির্জার স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ধর্মযাজকদের সঙ্গে শাসক ও জনগণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল, তাই এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে মোঙ্গলরা সহজেই ইউরোপ আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ইউরোপের পরিস্থিতিই তাদের সামনে ইউরোপ আক্রমণের পথকে সুগম করেছিল।

অবশ্য মোঙ্গলদের এ যুদ্ধাভিযান ইউরোপ ও সিরিয়াবাসীর জন্য একদিক থেকে শাপে বর হয়েছিল। কেননা, ইউরোপ ও সিরিয়াবাসী তখন অ্যাসাসিনদের[১] অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল। অ্যাসাসিনরা দিনে দিনে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। তাদের প্রতিহত করা দুরূহ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ১২৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হালাকু খান মোঙ্গলবাহিনী নিয়ে এসে তাদের ধ্বংস করে। সমস্ত দুর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। সর্বত্র তাদের ধ্বংসের চিহ্ন লেগে থাকে।

মোঙ্গলরা তখন এমন শক্তিধর দুর্ধর্ষ জাতিতে পরিণত হয় যে, তাদের নাম শুনলেই ইউরোপীয়দের ঘাম ছুটত। থরথর করে কাঁপত তারা। ইউরোপীয়রা তাদের মোকাবিলা করতে অক্ষম ছিল। ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে মামলুক সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ যদি তাদের অপ্রতিরোধ্য জয়রথ থামিয়ে না দিতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে পশ্চিম-ইউরোপের বিশাল একটি অঞ্চল তারা হজম করে ফেলত।

---

[১] 'হাশিশিয়িন' ও 'হাশাশিন'—শব্দগুলো হাশিশ নামক একপ্রকার মাদকখোর গুপ্তঘাতকদের এ নামে ডাকা হতো। হাশিশ তৈরি হতো ক্যানাবিস স্যাটিভা নামক পাহাড়ি গাছের বাছাই করা কালচে-বাদামি রঙের ফুলের আঠা দিয়ে। শণের মতো এই গাছের শুকনো পাতা হচ্ছে ভাং বা সিদ্ধি এবং কাঁচা পাতা ও ফুলের রস শুকিয়ে বড়ি বানিয়ে তৈরি হয় চরস। ক্রুসেডের সময় হাশাশিনরা সুন্নি মুসলমানদের গুপ্তহত্যায় মেতে ওঠে। যাওয়ার সময় তারা প্রচুর হাশিশ খেয়ে নিত। তাই তাদের আরবি ভাষায়, 'হাশাশিন' বা হাশিশখোর বলা হতো। এ থেকেই ইংরেজি শব্দ Assasin (অ্যাসাসিন)-এর উৎপত্তি।

এরা ছিল পেশাদার গুপ্তঘাতক। ইসমাইলি শিয়া মতবাদের অনুসারী এই গুপ্তঘাতকরা ইতিহাসে অ্যাসাসিন, হাসানি, ফিদাইন নামে পরিচিত। ইসমাইলিয়্যাহ, বাতিনিয়্যাহ (আকিদা-বিশ্বাস গোপনকারী), তালিমিয়্যাহ (গুপ্তহত্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত), মুলাহিদা (ধর্মত্যাগী)-সহ আরও নানা নামে এরা পরিচিত ছিল। অবাক করা তথ্য হলো, এদের প্রতিষ্ঠাতা একজন মুফতি। যে কিনা আবার জগদ্‌বিখ্যাত এক আলিমের শিষ্যও। তার নাম হাসান ইবনু সাব্বাহ।—সম্পাদক।

অবশ্য এশিয়ার মুসলমানদের তুলনায় ইউরোপের খ্রিস্টানরা মোঙ্গালঝড়ের খুব সামান্য তাণ্ডবই প্রত্যক্ষ করেছে। বলা যায়, মোঙ্গালঝড় প্রায় পুরোটাই এশিয়ার মুসলমানদের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। তারা মোঙ্গালদের ধ্বংসযজ্ঞ ও বর্বরতার সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছে। যেমন : পশ্চিম-এশিয়ায় মোঙ্গালরা বাগদাদ ধ্বংস করে। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খান আব্বাসি খিলাফতের পতন ঘটায়। চীনের কিন (Kin)[৮] বংশকে উৎখাত করে। এই কিন বংশের লোকেরা প্রাচীনকালে চীনের উত্তরাঞ্চল শাসন করত। এ ছাড়াও মোঙ্গালরা চীনের দক্ষিণাঞ্চল, খাওয়ারিজম, পারস্য ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে অভিযান চালায়। এমনকি হিন্দুস্থানেও মোঙ্গাল শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

এসব ঘটনা থেকে যেকোনো একটি ঘটনাই মোঙ্গালদের ইতিহাস অধ্যয়নের গুরুত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, যখনই কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতির পতন ঘটে, তখনি ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে বিশাল আন্দোলনের সূচনা হয়। মানবতার প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ গ্রিকদের ওপর পারসিকদের আধিপত্য বিস্তারের পর শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেখানে বিশাল বিপ্লব সূচিত হয়। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ওপর উসমানিরা আধিপত্য বিস্তারের পর সেখানে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি মানুষের অভিনিবেশ বৃদ্ধি পায়। মধ্যযুগে মুসলমানদের হাতে স্পেন বিজিত হওয়ার পর ইউরোপে প্রথম জ্ঞানবিজ্ঞান, চিকিৎসা, দর্শন ও সাহিত্যের আলো পৌঁছায়। মোঙ্গালদের ইতিহাসেও এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন : বাগদাদ পতনের পর হিউম্যান স্টাডিজ সেন্টার মিসরে স্থানান্তরিত হয়। সে সময় আলিম, বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকগণ মুসলিমবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা যেসব অঞ্চলে যান, সেখানে পরবর্তীকালে বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ-পরীক্ষাকেন্দ্র বাগদাদ থেকে মিসরের কায়রোতে স্থানান্তরিত করা হয়। এভাবে পশ্চিমারা মুসলমানদের শিল্প-সংস্কৃতি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও চিন্তা-দর্শন অর্জনের সুযোগ লাভ করে।[৯] ক্রুসেডের সময় তারা এগুলো দ্বারা অনেক উপকৃত হয়েছে। মুসলমানদের জ্ঞানকে তারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

অপর এক দৃষ্টিকোণ থেকেও মোঙ্গালদের উত্থানকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনা করা হয়; যেহেতু তাদের উত্থানে এশিয়ায় অনেক ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনটি হলো, মোঙ্গাল প্রশ্নে এশিয়াবাসীর ঐক্য গড়ে ওঠে। তারা সবাই তখন একজোট হয়। তবে এটা রাজনৈতিক কিংবা জাতিগত কোনো ঐক্য ছিল

[৮] এ বংশের সর্বাধিক প্রচলিত নামটি হলো জুরচেন জিন (Jurchen Jin)। তবে তাদের আরও কয়েকটি নামে পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন : কিন বংশ (Kin Dynasty), জিন বংশ (Jinn Dynasty)। লেখক এই গ্রন্থে উক্ত বংশের আলোচনায় 'কিন' শব্দটা আনায় আমরা পুরো গ্রন্থে এ বানান রেখেছি।—সম্পাদক।

[৯] আল-মুগুল, সাইয়িদ বাক্স আল আরিনি : ২৬।

না। কেননা, এ ধরনের ভ্রান্ত মতবাদ তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তারা মূলত নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এই ঐক্যের তাৎক্ষণিক কোনো সুফল তারা লাভ করতে পারেনি। কেননা, মোঙ্গলরা শুধু যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তা নয়; বরং সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল। পথঘাট ছিল জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। মুসাফির নিরাপদে সফর করতে পারত। তবে যাত্রাপথে কেউ কোনো মোঙ্গল শাসকের লাশবহরের মুখোমুখি হলে লাশ বহনকারীরা তাকে সেখানেই মেরে ফেলত। তাদের পথে আসা প্রত্যেককে হত্যা করত।

ধর্মীয় উদারতার জন্য মোঙ্গলরা বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। এটি ছিল তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে এটিকে তাদের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা হলেও মূলত এর পেছনে যে কারণটি সক্রিয় ছিল তা হচ্ছে, ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের অনাগ্রহ ও উদাসীনতা। ধর্মকে তারা তেমন একটা গুরুত্ব দিত না; উপেক্ষা করে চলত। তাদের এই উদারতার সুদৃঢ় কোনো মানদণ্ড ছিল না। ধর্ম যাতে স্বার্থসিদ্ধির পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সে জন্য তারা ধর্মীয় ব্যাপারে উদারতার পরিচয় দিয়েছিল। সব ধর্মের শাসক ও সম্পদশালীদের থেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই উদারতা তাদের বেশ কাজে লেগেছিল।

দুই. মোঙ্গলদের পরিচয়

বিশ্ব-ইতিহাসের মঞ্চে মোঙ্গলদের উত্থান ঘটেছিল হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দী মোতাবেক খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। এরপর হিজরি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশক মোতাবেক খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তারা বিশ্বপরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। নিজেদের ভূখণ্ডের বাইরেও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে।

মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রথম ও শেষ দৃষ্টান্ত এই মোঙ্গলরাই স্থাপন করেছে। মাত্র তিন দশকে বিশ্বপরাশক্তিরূপে আবির্ভূত হয় তারা। তাদের এই বিশাল সাম্রাজ্য পূর্ব-জাপানি দ্বীপপুঞ্জ ও প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ইউরোপীয় মহাদেশের মধ্যভাগ পর্যন্ত এবং উত্তরে সাইবেরিয়া ও বাল্টিক সাগর থেকে শুরু করে দক্ষিণে আরব উপদ্বীপ, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মোঙ্গল ও তাতাররা অভিন্ন নাকি ভিন্ন জাতি

পূর্ববর্তী ইতিহাসবিদগণ, বিশেষত আরব ইতিহাসবিদরা এবং যারা মোঙ্গলদের উত্থান ও মুসলিমবিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধাভিযান প্রত্যক্ষ করেছে, তাদের মতে মোঙ্গল

ও তাতাররা ভিন্ন কোনো জাতি ও সম্প্রদায় নয়; বরং তারা এক ও অভিন্ন। পরবর্তী ইতিহাসবিদরা, এমনকি আমাদের সমকালীন অনেক ইতিহাসবিদও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন; অথচ এটি সম্পূর্ণ ভুল মত। এই ভুল যে শুধু আরবের মুসলিম ইতিহাসবিদরাই করেছেন তা নয়; বরং পাশ্চাত্যের অনেক ইতিহাসবিদ ও পর্যটক এই ভুলের শিকার হয়েছেন। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের পূর্ববর্তী ইতিহাসবিদরা। তবে পশ্চিমা বড় বড় গবেষক ও প্রাচ্যবিদ—যেমন : রাশিয়ান দুই গবেষক এমিল ব্রেট্শ্নাইডার (Emil Bretschneider) ও ভাসিলি বারটোল্ড (Vasily Bartold), জার্মান ঐতিহাসিক সোলজার, ইংরেজ ইতিহাসবিদ জে. অ্যাভ্রু বয়েল (J. A. Boyle)-সহ আরও অনেকে মোঙ্গল ও তাতারদের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।

মুসলিম ইতিহাসবিদ রাশিদুদ্দিন আল উজির মূলত এটিই লিখেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *জামিউত তাওয়ারিখ-এ* যা লিখেছেন, পাশ্চাত্যবিদরা তার সাহায্য নিয়েছে। তারপর যে-সকল চীনা ইতিহাসবিদ মোঙ্গলদের ইতিহাস রচনা করেছেন এবং তাদের যেসব গ্রন্থ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে—যেমন : রুশ, জার্মান, ফরাসি ও ইংরেজি; সেগুলোর মধ্যেও এই পার্থক্য প্রতিফলিত হয়েছে। এ ছাড়া মোঙ্গলীয় ভাষায় মোঙ্গলদের ইতিহাস নিয়ে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, অনেক প্রাচ্যবিদ হয়তো সেসব গ্রন্থ থেকে জেনেছেন। আর এ তথ্যটি মৌলিকত্ব পেয়েছে *আত-তারিখুস সিরারিয়্যা লিল মুগুল আও তারিখুল মুগুলিস সিরারিয়্যা* নামক গ্রন্থে। এর ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি, মোঙ্গল ও তাতার ভিন্ন দুটি জাতি। তবে উভয় জাতির মধ্যে পরিচয়গত একটি যোগসূত্র থাকতে পারে। সংক্ষেপে আমরা কথাটি এভাবে বলতে পারি, তাতার মানেই মোঙ্গল; কিন্তু মোঙ্গল মানেই তাতার নয়। তাতার মোঙ্গলদেরই একটি শাখা; তবে মোঙ্গলরা তাতারদের শাখা নয়। মোঙ্গলরা হলো উৎসমূল; তাতাররা নয়। সকল তাতারের মধ্যে মোঙ্গলদের রক্ত থাকলেও সকল মোঙ্গলীয়ের মধ্যে তাতারদের রক্ত নেই। যদিও মোঙ্গলদের থেকে তাতারদের বংশবিস্তার লাভ করেছিল, তারা মোঙ্গলদের শাখা ছিল, তবে এ কথা সত্য যে, তাতাররা একটি পৃথক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে এবং সুদীর্ঘকাল মোঙ্গলদের শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল।

আমরা এখন যে সময়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, তা ছিল মোঙ্গলদের ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। তারা চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে একত্রিত হয়। চেঙ্গিস খান তাতারদের পরাজিত করে। তাদের পুরুষদের হত্যা করে। নারী ও শিশুদের বন্দি করে তাদের দাস-দাসী হিসেবে ব্যবহার করে। এভাবে চেঙ্গিস খানের হাতে তাতাররা একরকম ধ্বংস হয়ে যায়। মোঙ্গলরা তাদের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করে। দলে দলে মানুষ চেঙ্গিস খানের নেতৃত্ব মেনে নিতে থাকে। এভাবে একসময় মোঙ্গলরা একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

করে; ইতিহাসে যা মোঙ্গল সাম্রাজ্য নামে পরিচিত—এটি তাতার সাম্রাজ্য নয়।[১০]

তিন. মোঙ্গলদের আদিবাস

মোঙ্গলরা মধ্য-এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে বসবাস করত। তাদের এই আবাস পশ্চিমে সাইহুন (Syr Darya) ও জাইহুন নদী (Amu Darya) থেকে পূর্বে চীনের পার্বত্য সীমান্ত এবং উত্তর-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোনো কোনো সম্রাট তাদের এই বসবাসের সীমানা বিস্তৃত করে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর (Adriatic Sea)[১১] পর্যন্ত নিয়ে যায়। তবে মঙ্গোলিয়ার পার্বত্য এলাকা, তিয়ানশান ও আলতাই পর্বতমালা (Tian Shan and Altai Mountains) এবং উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সমভূমি, গোবি মরুভূমি, বৈকাল হ্রদ (Lake Baikal) ও সে অঞ্চলের অন্যান্য নদীর তীরবর্তী চারণভূমিই ছিল তাদের প্রধান আবাস-অঞ্চল। এসব অঞ্চলেই সাধারণত তারা বসবাস করত। অবশ্য শীতকালে বিভিন্ন পর্বতশ্রেণিতে অবস্থিত সমভূমি ও উষ্ণপ্রধান এলাকায় বসবাস করা পছন্দ করত। কারণ, শীতের মৌসুমে সেখানে পশুর খাবারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য পাওয়া যেত। অনেক ঘাস ও লতাপাতা জন্মাত। গ্রীষ্মকালে দু-তিন মাসের জন্য তারা উঁচু ভূমি ও পাহাড়ের উপরে চলে যেত। সেখানের আবহাওয়া তখন শীতল হতো এবং খাদ্যশস্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত।

সমুদ্র থেকে এই অঞ্চলগুলোর দূরত্ব, পাশাপাশি উচ্চতা এর জলবায়ু পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। এখানকার বেশির ভাগ অঞ্চলে সাধারণত তাপমাত্রা শূন্যের ওপর ৩৮ ডিগ্রি অথবা শূন্যের নিচে ৪২ ডিগ্রিতে নেমে আসত। ফলে বছরের অধিকাংশ সময় নদনদী ও হ্রদের পানি জমে বরফ হয়ে থাকত। উপরন্তু উত্তরে অবস্থিত সাইবেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল থেকে প্রায়শই শৈত্যপ্রবাহ প্রবাহিত হতো; কিন্তু গ্রীষ্মকালে দেখা যেত এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। তখন বেড়ে যেত তাপমাত্রা। আবহাওয়া হয়ে উঠত অনেক উষ্ণ। ধেয়ে আসত ধূলিঝড়। সামান্য পানির জন্য তারা গোবি মরুভূমি ছুটে বেড়াত। গোবি নামের অর্থ দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য। তারা পশুর খাদ্যশস্যের জন্য পাহাড়-পর্বতে অবস্থিত উঁচু-নিচু বিভিন্ন উপত্যকা চষে বেড়াত। খরা বা অনাবৃষ্টির কারণে গবাদি পশুর খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিলে সেগুলো নিয়ে তারা পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলে যেত। যেহেতু তাদের নিকট প্রচুর গবাদি পশু থাকত, তাই সেগুলোকে বাঁচানোর জন্য বাধ্য হয়ে তাদের এমন করতে হতো।

---

[১০] *সুকুতুত দাওলাতিল আব্বাসিয়া* : ৫৪।

[১১] অ্যাড্রিয়াটিক সাগর ভূমধ্যসাগরের সর্ব-উত্তরের একটি জলবাহু, যা দক্ষিণ ইউরোপে ইতালির পূর্বে ও বলকান উপদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এর উপকূল ঘিরে যে কয়টি দেশ রয়েছে, তা হলো—ইতালি, আলবেনিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া, মন্টিনিগ্রো ও স্লোভেনিয়া।—সম্পাদক।

ক্রুসেড বিশ্বকোষ - ৫

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

ক্রুসেড বিশ্বকোষ-৫

মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল : ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

ভাষান্তর

যায়েদ আলতাফ

মানসূর আহমাদ

সম্পাদক

আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

তৃতীয় সংস্করণ : জুন ২০২২
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৯

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩৫০, US $ 18. UK £ 13

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ
মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96590-2-0

Mongol o Tatarder Etihas[2nd Part]
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস বার বার ফিরে আসে, কথাটা জ্বলন্ত সত্য। যে কালপর্ব আমরা অতিক্রম করছি এবং আত্মবিস্মৃতির যে জীবন আমরা যাপন করছি—মুসলমানদের করুণ ইতিহাস আবারও যে ফিরে আসছে, সেটা ভাবার যথেষ্ট কারণ ও কার্যকারণ তাতে রয়েছে। ফিলিস্তিন, আরাকান, ইরাক, সিরিয়া, পূর্ব তুর্কিস্তান আর কাশমিরে বয়ে চলছে রক্তের নদী। পৃথিবীর প্রায় পুরো মানচিত্রে, প্রতিটি জনপদে নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলিমের অশ্রুধারা, রক্তমাখা ছবি। তাদের বুকফাটা আর্তনাদ, আহাজারি প্রকম্পিত করে তুলছে আকাশ—খোদার আরশ। মনে হচ্ছে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে সেই চেঙ্গিসি ঝড়—খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতে যা উঠে এসেছিল গোবির তৃণহীন মরুভূমি থেকে। আকাশ আঁধার করে-আসা সেই সর্বনাশা ঝড়ের কালো ছায়া এসে পড়েছিল শক্তিশালী খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ও জাতির ঐক্যের কেন্দ্রভূমি বাগদাদকেন্দ্রিক আব্বাসি খিলাফতের ওপর; কিন্তু বিতর্কপ্রিয় অচেতন জনগোষ্ঠীর কেউই তেমন গুরুত্ব দেয়নি সে দিন। সতর্ক হয়নি সে ঝড় থেকে আত্মরক্ষার জন্য। একসময় সেই ঝড় প্রচণ্ড আকার ধরে আছড়ে পড়ে খাওয়ারিজমের ওপর এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে এই শক্তিমান ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যকে; কিন্তু খাওয়ারিজমের করুণ অবস্থা দেখেও সতর্ক হওয়ার গরজ অনুভব করেনি পাশের বাগদাদ। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়। মোঙ্গল ও তাতার নামক সেই প্রলয়ংকরী তাণ্ডবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিশাল আব্বাসি খিলাফত। পুরো মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ত্রাস, শঙ্কা আর উৎকণ্ঠা। রক্তের স্রোতে তলিয়ে যেতে থাকে দারুল খিলাফাহ বাগদাদ। তৎকালে সারা বিশ্বের বিদ্যার্থীদের জ্ঞানকেন্দ্র হয়ে ওঠা দারুল হিকমার সমস্ত গ্রন্থ অশিক্ষিত-বর্বর মোঙ্গলরা ফেলে দেয় দিজলা ও ফুরাতে, গ্রন্থের কালিতে কালো হয়ে যায় নদীর পানি। জীবিতরা আশ্রয়ের খোঁজে পালাতে থাকে মিসরের দিকে—মামলুক সুলতানের আশ্রয়ে।

মানুষ মনে করেছিল তাতারঝড় একটা খোদায়ি গজব, কিয়ামত-পূর্ব ইয়াজুজ-মাজুজের বাহিনী। কেউ কেউ ভাবছিল এরা দাজ্জালের বাহিনী; তাই মানুষের সাধ্য নেই এই ঝড় মোকাবিলার। মুসলিমবিশ্বের ওপর বয়ে-যাওয়া এ তাণ্ডব দেখে সেদিন থরথর করে কাঁপছিল ইউরোপও। হ্যারল্ড ল্যাম্বের ভাষায়, 'সুইডেন ও ভেনিসের জেলেরা তাতারদের ভয়ে সাগরে মাছ ধরার নৌকা ভাসাতে ভয় পেত।'

জাতিকে রক্ষার জন্য তখন প্রয়োজন ছিল এমন একজন নেতার, যার মধ্যে থাকবে

জিহাদের পূর্ণ জজবা। ইমান হবে পাথরের চেয়ে কঠিন ও দৃঢ়, সাহস থাকবে পাহাড়ের চেয়ে উঁচু; আর জাতির প্রতি প্রেম ও দরদে দিলটা থাকবে সাগরের চেয়ে বিশাল ও গভীর। সেই ক্রান্তিকালে মহান আল্লাহ মামলুক সুলতানদের থেকে চয়ন করে নিয়েছিলেন সাইফুদ্দিন কুতুজ নামের এক মুজাহিদকে, যিনি ইমান ও জিহাদের মাঠে আবির্ভূত হয়েছিলেন ধূমকেতুর গতি নিয়ে। আইন জালুতের মহারণে চির-অজেয় আখ্যা পাওয়া তাতারদের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিয়ে উম্মাহর স্বপ্নের আকাশে উদয় হয়েছিলেন ধ্রুবতারা হয়ে। পালটে দিয়েছিলেন ইতিহাসের মোড়। ধীরে ধীরে ফিরে আসতে থাকে মুসলমানদের গৌরবময় হারানো অতীত।

ইতিহাসকে তুলনা করা হয় আয়নার সঙ্গে। ইতিহাসের পাতায় দেখে নিতে হয় অতীতের উত্থানের কারণ, পতনের প্রধান নিয়ামক। জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে অনুসরণ করতে হয় সেই উত্থানের মাধ্যমগুলোর এবং পরাজয় থেকে বাঁচতে হলে পরিহার করতে হয় পতনের কারণসমূহ। এমনই এক ইতিহাস হচ্ছে মামলুক সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ রাহ.-এর জীবনেতিহাস।

এটি 'ক্রুসেড বিশ্বকোষ' সিরিজের পঞ্চম সিরিজ *মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড। গ্রন্থটির লেখক বিশ্বখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি এ অংশটি প্রকাশ করেছেন—মোঙ্গাল ও তাতারদের ইতিহাসের অংশ হিসেবে; আবার *সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ* নামে আলাদাভাবেও। তাই আমরাও লেখকের অনুসরণে দুভাবেই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছি। তাই এটি হবে *মোঙ্গাল ও তাতারদের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড); আবার *সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ দ্য ব্যাটালিয়ন* নামেও প্রকাশিত হলো।

গ্রন্থটি বিষয়-বিবেচনায় যথেষ্ট কঠিন এবং ভাষিক উপস্থাপনায় সৌকর্যপূর্ণ ও আলংকারিক। অনেকেই এমন গ্রন্থ অনুবাদে হিমশিম খেয়ে যান। মানুষের নাম, জায়গার নাম, জিনিসপত্রের নাম, তারিখ ইত্যাদি এতই জটপাকানো যে, হিমশিম খাওয়া আশ্চর্যের কিছু না; কিন্তু মানসূর আহমাদ তার যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে যথেষ্ট সাবলীলতার সঙ্গে গ্রন্থটির অনুবাদ সমাপ্ত করেছেন। ভূমিকা অনুবাদ করেছেন যায়েদ আলতাফ। সম্পাদনা করেছেন প্রবীণ লেখক আবদুর রশীদ তারাপাশী। দ্বিতীয় সংস্করণের ভাষা ও বানানের কাজ করেছেন আবদুল্লাহ আরাফাত।

আমরা আমাদের চেষ্টায় কতটুকু সফল সেটা নিরীক্ষণ করবেন পাঠকসমাজ। আশা করব, যেকোনো পর্যায়ের ভুলত্রুটি নজরে এলে কালান্তরকে অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ কালান্তর আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
২২ ডিসেম্বর ২০১৯

অনুবাদকের কথা

বাংলাদেশে সঠিক ইতিহাসচর্চা খুবই কম হয়। পাঠ্যবইয়ে জোর করে ইতিহাস গেলানো হলেও স্বতঃপ্রণোদিত ইতিহাসচর্চা হয় না বললেই চলে। আমরা অনেকেই *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার* নাম শুনেছি; কিন্তু পড়েছি কজন? আর পড়ব দূরের কথা, নামই-বা জানি কয়টি গ্রন্থের! যখন দেখি বড় বড় আলিম পর্যন্ত সাইফুদ্দিন কুতুজের নামটা জানেন না, তখন দুঃখে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হয়। ইতিমধ্যে দুজন মুহাদ্দিস আলিমকে 'ইদানীং কী লিখছ?'—প্রশ্নের জবাবে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির নাম জানিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উভয়কেই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়েছে সাইফুদ্দিন কুতুজ কে ছিলেন, কী ছিলেন!

আমরা হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদের সুবিশাল পাঠাগার ধ্বংসের কাহিনি খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে পারি; কিন্তু সেই হালাকুর বাহিনীকে যিনি পরাজিত করলেন, তাঁর নামটা পর্যন্ত জানি না—আমাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কে হতে পারে! একটা জাতি যদি নিজেদের পূর্বসূরিদের না চেনে, তারা কীভাবে শিক্ষা নেবে! কোন পরিস্থিতিতে কী পদক্ষেপ নিতে হয়, তা জানবে কীভাবে! পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে অজ্ঞ জাতি কীভাবে জেগে উঠবে! ইতিহাস তো অতীতের আয়নায় ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা।

ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি একজন আরব-ইতিহাসবিদ। বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের কাছে একজন গ্রহণযোগ্য ইতিহাস-বিশ্লেষক। মুসলিম উম্মাহকে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে, উম্মাহর সিংহপুরুষদের বীরত্বের কাহিনি স্মরণ করিয়ে দিতে এবং পূর্বসূরিদের অনুসৃত রীতিতে জাগিয়ে তুলতে তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন নিরলস প্রয়াস।

আমাদের এ গ্রন্থটি তাঁর রচিত *আল-মুগুল বাইনাল ইনতিশার ওয়াল ইনকিসার* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড। এর গুরুত্ব বিবেচনা করে ড. সাল্লাবি যেভাবে একে *সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ* নামে আলাদা গ্রন্থের রূপ দিয়েছেন, তেমনিভাবে আমরাও আলাদাভাবে প্রকাশ করেছি।

গ্রন্থটির অনুবাদে অনুসৃত নীতি : কিছু কৈফিয়ত

- 'কুতুজ' বানানের ক্ষেত্রে অনেকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। 'কুতয' 'কুতুয' 'কুতুজ'—কোনটা শুদ্ধ? আমরা কুতুজ বানানে কেন লিখলাম? আমাদের

অনুসন্ধান অনুযায়ী আরবি নামে ত্বা বর্ণে পেশ আছে। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ ড. কাসিম আবদুহু রচিত কুতুজের জীবনীতে 'ত্বা' বর্ণে পেশ দিয়ে লেখা হয়েছে। তা ছাড়া ইংরেজি উইকিপিডিয়ায় সরাসরি Qutuz বানানে লেখা হয়েছে। তাই আমরা মনে করি, কুতয বানানের চেয়ে কুতুয/কুতুজ অধিক বিশুদ্ধ। আর যেহেতু গ্রন্থটিতে আমরা প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করেছি, তাই অন্তস্থ য-য়ে না লিখে বর্গীয় জ-য়ে লিখেছি। এই হিসেবে কুতুয বানানটা চলনসই হলেও কুতুজ বানানই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে।

- এভাবে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা অধিক গ্রহণযোগ্য ও অধিক বিশুদ্ধ বানান গ্রহণের চেষ্টা করেছি। যেমন, তাতারি না লিখে তাতার লিখেছি।
- হাদিসের সূত্রের ক্ষেত্রে টীকায় শুধু গ্রন্থের নাম ও হাদিস-নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।
- তথ্যসূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে পাশাপাশি একই গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠানম্বর এলে শেষেরটা রাখা হয়েছে।
- পাঠকের প্রয়োজন ও উপকারের কথা ভেবে অনুবাদক বা সম্পাদকের পক্ষ থেকে কিছু টীকা সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।
- ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আরবিতে অনেক সময় কবিতা উদ্ধৃত করা হয়। বাংলায় সেগুলোর তেমন প্রয়োজন না থাকায় কিছু কবিতার অনুবাদ বাদ দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থটির অনুবাদের শুরু থেকে প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত অনেক ভাই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সুলতান কুতুজের অলংকারপূর্ণ দুর্বোধ্য একটি চিঠির মর্ম উদ্ধার করে দিয়েছেন মিসরে অধ্যয়নরত দিলওয়ার মিলকি ও আরও তিনজন, তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়াও অনেকে গ্রন্থের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন, বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন; সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সবশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে মিনতি, তিনি যেন বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য গ্রন্থটিকে কবুল করেন এবং আমাদের সবাইকে তাঁর দীনের জন্য কবুল করেন। আমিন।

মানসূর আহমাদ
১৮ মে ২০১৯
gelpenbd@gmail.com

ধা রা ক্র ম

লেখকের কথা # ১৫

তৃতীয় অধ্যায়

মামলুক সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন # ৩৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

মামলুকদের উৎস ও উত্থান **৩৯**

এক : মামলুক কারা ৩৯

১. নাজমুদ্দিন আইয়ুব ও মামলুকগণ ৪২

দুই : মামলুকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদীক্ষা-পদ্ধতি ৪৬

১. প্রথম স্তর ৪৭

২. দ্বিতীয় স্তর ৫১

৩. তৃতীয় স্তর ৫২

৪. খাওয়াপরা ও বিশ্রামের নিয়মাবলি ৫২

৫. ডিগ্রি ও শিক্ষাসমাপ্তির নিয়মকানুন ৫৩

৬. মামলুকদের ভাষা ৫৩

৭. মামলুকদের মধ্যে 'উসতাজ' সম্পর্ক ৫৪

৮. খুশদাশিয়া (সাথি) সম্পর্ক ৫৫

৯. তারা কি বহিরাগত ৫৫

১০. আধুনিক মিলিটারি অ্যাকাডেমি ৫৬

১১. মামলুক আমিরবিক্রেতা শায়খ ইজ্জুদ্দিন ৫৬

১২. অনন্যদের যুগ ৫৯

তিন : সপ্তম ক্রুসেড মোকাবিলায় মামলুকদের প্রচেষ্টা ৬০

১. মানসুরার যুদ্ধ ৬২

২. যুদ্ধের নেতৃত্বে তুরানশাহ ৬৩

৩. মামলুকদের বীরত্বের চিত্র ৬৫

৪. বন্দিত্ব ও সন্ধির শর্তাবলির মধ্যে নবম লুই ৬৬

৫. সপ্তম ক্রুসেড অভিযানে ক্রুসেডারদের পরাজয়ের কারণ ৬৭
৬. সপ্তম ক্রুসেডের ফল ৬৭
৭. তুরানশাহকে যেভাবে হত্যা করা হয় ৭২
চার : আইয়ুবি সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ৭৪
১. সংশোধন-সংস্কারের পথ পরিহার ৭৭
২. জুলুম ৮০
৩. বিলাসিতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ৮৩
৪. পরামর্শসভা বন্ধ করে দেওয়া ৮৫
৫. আইয়ুবি পরিবারে গৃহবিবাদ ৮৬
৬. খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ৮৭
৭. সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক প্রবাহ তৈরিতে আইয়ুবিদের ব্যর্থতা ৮৯
৮. কেন্দ্রীয় প্রশাসনে দুর্বলতা ৯০
৯. গোয়েন্দাবিভাগের দুর্বলতা ৯১
১০. রাজনৈতিক অঙ্গনে আল্লাহভীরু আলিমদের অনুপস্থিতি ৯২
১১. নাজমুদ্দিন আইয়ুবের মৃত্যু এবং যোগ্য উত্তরসূরির অভাব ৯৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মামলুকদের রাজত্বে শাজারাতুদ দুর ও ইজ্জুদ্দিন আইবেক ৯৫
এক : শাজারাতুদ দুর ৯৫
১. শাজারাতুদ দুর আইয়ুবি ছিলেন নাকি মামলুক ৯৫
২. মিসর-সম্রাজ্ঞী ৯৬
৩. তাঁর জন্য দুআ ৯৭
৪. তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা ৯৮
৫. তাঁর অভিষেক ৯৮
৬. শাজারাতুদ দুরের ক্ষমতারোহণকে সবার প্রত্যাখ্যান ৯৮
৭. শাজারাতুদ দুরের পদত্যাগ ৯৯
৮. ইসলামে নারী-নেতৃত্বের হুকুম ১০০
দুই : ইজ্জুদ্দিন আইবেকের রাজত্ব ১০৩
১. আইয়ুবি ও ক্রুসেডারদের শঙ্কা ১০৪
২. মামলুক ও আইয়ুবিদের মধ্যকার যুদ্ধ ১০৭
৩. মামলুক ও ক্রুসেডারদের মধ্যে চুক্তি ১০৮
৪. আব্বাসি খলিফার সমঝোতা-প্রচেষ্টা ১০৯
৫. মামলুকদের বিরুদ্ধে আরবীয় মিসরিদের বিদ্রোহ ১১০
৬. মামলুক সহকর্মীদের থেকে শঙ্কা এবং আকতাই হত্যা ১১৫

৭. সুলতান আইবেক ও শাজারাতুদ দুরকে হত্যা ১১৮
৮. আলি ইবনুল মুয়িজের রাজত্ব ও কুতুজের কর্তৃত্বগ্রহণ ১২২
৯. স্বরাষ্ট্র-বিষয়ে সাইফুদ্দিন কুতুজের পদক্ষেপ ১২৭

চতুর্থ অধ্যায়

আইন জালুতযুদ্ধ ও তাতারদের পরাজয় # ১২৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিলাদুশ শাম ও জাজিরায় তাতারদের দখলদারত্ব ১৩১
এক : সিলভানের (Mayafarikin) প্রতিরোধ ১৩১
১. তাতারদের মুখোমুখি আমিদ নগরী ১৩১
২. মায়াফারিকিন কর্তৃক তাতারদের চ্যালেঞ্জ ১৩২
৩. কামিল কর্তৃক তাতারদের বিরুদ্ধে কর্মসূচি গ্রহণ ১৩৩
৪. নাসির কর্তৃক কামিল আইয়ুবির পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান ১৩৩
৫. সিলভানের পতন ও কামিল আইয়ুবির শাহাদাত ১৩৫
৬. মারদিন ১৩৮
দুই : প্রতিরোধ ও আত্মসমর্পণে দ্বিধান্বিত নাসির ইউসুফ ১৪০
১. হালাকু কর্তৃক বাদশাহ নাসিরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ১৪০
২. মামলুকদের কাছে নাসিরের সাহায্য কামনা ১৪২
৩. হালাবের পতন ১৪৩
৪. দামেশক ১৪৭
৫ .বাদশাহ নাসির আইয়ুবির শেষ পরিণতি ১৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আইন জালুতযুদ্ধের পূর্বাভাস ও এর ঘটনাসমূহের অগ্রগতি ১৫৪
এক : মিসর দখল করা তাতারদের কৌশলগত লক্ষ্য ১৫৪
দুই : মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধকরণে কুতুজের পদক্ষেপ ১৫৫
তিন : সাইফুদ্দিন কুতুজের প্রতি হালাকুর চিঠি ১৬৩
১. যুদ্ধের পরামর্শসভা ১৬৬
২. সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা ১৬৭
৩. হালাকুর দূত হত্যা ১৬৮
চার : চূড়ান্ত দিন ১৭০
১. যুদ্ধের আগে ১৭০
২. মুসলিমবাহিনীর পদক্ষেপ ১৭১

৩. গাজার যুদ্ধ ১৭১
৪. গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা-তথ্যাবলি ১৭৩
৫. মামলুক-মোঙ্গলদের মধ্যে তুমুল লড়াই ১৭৪
৬. মোঙ্গল-সেনাপতির বীরত্ব ১৭৬
৭. দামেশক ও বিলাদুশ শাম মুক্তকরণ ১৭৮
৮. দামেশকে সাইফুদ্দিন কুতুজের আগমন ১৮০
৯. শামের শাসনক্ষমতা সুবিন্যস্তকরণ ১৮১
১০. পরাজয়ের পর হালাকুর পদক্ষেপ ১৮২
পাঁচ : কুতুজ হত্যা ১৮৩
১. কুতুজ হত্যার কারণ ১৮৫
২. মামলুকদের সিংহাসনে আরোহণের পদ্ধতি ১৮৭
৩. কুতুজ হত্যার ফল ১৮৮
৪. কুতুজের সমাধি ও ইজ ইবনু আবদুস সালামের প্রশংসা ১৯০
৫. মোঙ্গলদের পুনরাক্রমণ ১৯১
ছয় : আইন জালুতে মুসলমানদের বিজয়ের কারণ ১৯৩
১. বিচক্ষণ নেতৃত্ব ১৯৩
২. কুতুজের ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইমানি দৃষ্টিভঙ্গি ১৯৬
৩. যোগ্য লোকের কাছে দায়িত্ব অর্পণ ২০১
৪. শক্তিশালী বাহিনী ২০৪
৫. জিহাদের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি ২০৫
৬. প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপকরণ গ্রহণের পন্থা ২০৬
৭. পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রতিভা ২১১
৮. সাইফুদ্দিন কুতুজের দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণ রাজনীতি ২১৫
৯. বিজয়ী দলের গুণাবলি অর্জন ২১৭
১০. ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া এবং বীরদের বৈধ উত্তরাধিকার ২১৯
১১. আলিমদের সাহায্য ও পরামর্শ প্রার্থনা ২২১
১২. দুনিয়াবিমুখতা ২২৩
১৩. মোঙ্গল রাজপরিবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব ২২৩
১৪. জালিম ও সীমালঙ্ঘনকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর রীতি ২২৫
সাত : আইন জালুতযুদ্ধের প্রভাব ও ফল ২২৬
১. মোঙ্গলদের দখলদারত্ব থেকে বিলাদুশ শাম মুক্তকরণ ২২৭
২. শাম ও মিসরের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা ২২৭
৩. মামলুকদের বিরোধীশক্তি দমন ২২৮
৪. পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় ২২৯

৫. মানবেতিহাসের চূড়ান্ত ঘটনা ২৩০
৬. মুসলিম উম্মাহর মধ্যে নবজাগরণ ২৩১
৭. থেমে গেল মোঙ্গলদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ধারা ২৩১
৮. ক্রুসেডার ও তাতারদের মধ্যকার মৈত্রীচুক্তির ব্যর্থতা ২৩২
৯. ক্রুসেডারদের দুর্বল অস্তিত্ব ২৩২
১০. কায়রো শহর ২৩৩
১১. বীর মামলুকদের রাজত্বের সূচনা ২৩৩
১২. আব্বাসি খিলাফতের প্রতীকী যুগ ২৩৪
১৩. মামলুক ফৌজের উন্নয়ন ও অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণ ২৩৪
সারকথা **২৩৬**

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি। আমরা নিজেদের আত্মার অনিষ্ট ও আমলের ভুলত্রুটি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল।

> হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো; আর তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]
>
> হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন; আর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাকো। আর ভয় করো রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। [সুরা নিসা : ১]
>
> হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলো শুদ্ধ ও পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আল্লাহ, আপনার মর্যাদা ও ক্ষমতার বিশালত্বের চাহিদানুযায়ী আপনার প্রশংসা, আপনি সন্তুষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনার প্রশংসা, সন্তুষ্ট হওয়ার পরও আপনারই প্রশংসা। সকল প্রশংসা মহান প্রভুর জন্য, তাঁর মর্যাদা অনুপাতে। সকল স্তুতি মহান রবের জন্য, যা তাঁর পূর্ণতার উপযোগী। সকল স্তব মহান আল্লাহরই জন্য, তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার চাহিদা অনুপাতে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি *আল-মুগুল বাইনাল ইনতিশার ওয়াল ইনকিসার* গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ। গ্রন্থটিতে মামলুক তথা দাস সাম্রাজ্যের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। তাদের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদীক্ষা, বেড়ে ওঠা, জীবনাচার, শিক্ষা সমাপন ও সনদগ্রহণের বিশেষ রীতি, ভাষাগত ঐক্য, শিক্ষক-ছাত্র ও সহপাঠীদের মধ্যকার সম্পর্ক, তাদের কিনে নিয়ে যারা তালিম-তারবিয়াত ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন; সেই উসতাজদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, সপ্তম ক্রুসেড আক্রমণ প্রতিরোধে তাদের অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব ও গৌরবময় বীরত্ব, ক্রুসেডারদের পরাজয়ের কারণ ও তার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে :

১. মামলুকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি।
২. মিশন বাস্তবায়নে ফরাসিদের ব্যর্থতা।

তারপর আইয়ুবি সাম্রাজ্যের পতন ও আইয়ুবি বংশের শেষ সুলতান তুরানশাহকে হত্যার ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে। আইয়ুবি সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে অনেক কারণ সক্রিয় ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। যেমন :

১. সংস্কারমূলক কাজকর্ম থেমে যাওয়া।
২. শোষণ-নিপীড়ন।
৩. ভোগবিলাস ও প্রবৃত্তিপূজা।
৪. শূরাপদ্ধতি বাতিলকরণ।
৫. আইয়ুবি-পরিবারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত।
৬. খ্রিস্টানদের সঙ্গে মিত্রতা।
৭. সভ্যতার বিনির্মাণে আইয়ুবিদের ব্যর্থতা।
৮. কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা।
৯. গোয়েন্দাবিভাগের দুর্বলতা।
১০. রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে হক্কানি আলিমদের অনুপস্থিতি।
১১. আল মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দিনের মৃত্যু ও তাঁর যোগ্য উত্তরসূরির অভাব।

এরপর মিসরের সম্রাজ্ঞী শাজারাতুদ দুর (Shajarat al-Durr) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর বংশপরিচয় কী, তিনি আইয়ুবি ছিলেন নাকি মামলুক, সম্রাজ্ঞী হিসেবে তাঁর মিসরের ক্ষমতায় আরোহণ, তারপর নারী হওয়ায় আব্বাসি খলিফা, আলিম ও সাধারণ জনগণ কর্তৃক তাঁর নেতৃত্ব মেনে না নেওয়া, অবশেষে চাপের মুখে

তাঁর ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া, তারপর ইজ্জুদ্দিন আইবেককে ক্ষমতায় বসানো এবং তাঁকে বিয়ে করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নারীনেতৃত্বের শরয়ি বিধান, ইজ্জুদ্দিন আইবেকের শাসনামলের রাষ্ট্রীয় সংকট ও বিপদ—যেমন : আইয়ুবি ও ক্রুসেডারদের বিপদ, মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘাতের সুযোগ নিয়ে ফ্রান্সের অধিপতি নবম লুইয়ের (Louis IX) অপতৎপরতা এবং মুসলমানদের ক্ষতি করার প্রচেষ্টা, মিসর ও সিরীয় শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে নবম লুইয়ের দূত প্রেরণ, মামলুক ও আইয়ুবিদের মধ্যে সমঝোতার ব্যাপারে আব্বাসি খলিফার উদ্যোগ গ্রহণ, মিসরে মামলুকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আরব গোত্রের বিদ্রোহ ও তা দমনে মামলুকদের পদক্ষেপ, বাহরিয়া মামলুক শাসক ফারিস আকতাইয়ের (Faris ad-Din Aktai) ইজ্জুদ্দিন আইবেকের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ানো, তারপর আইবেকের তাঁকে মেরে ফেলা, আইবেক আবার স্ত্রীসহ শাজারাতুদ দুরের হাতে নিহত হওয়া, তারপর শাজারাতুদ দুরকে হত্যা করে আইবেক-সমর্থকদের প্রতিশোধ নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই অধ্যায়ে ইজ্জুদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর তাঁর ছয় বছর বয়সি পুত্র আল মালিকুল মানসুর আলি ইবনুল মুয়িজের সিংহাসনে সমাসীন হওয়া; তারপর তাঁর কাছ থেকে সাইফুদ্দিন কুতুজের ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কুতুজের গৃহীত পদক্ষেপ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

আইন জালুতের অবিস্মরণীয় যুদ্ধ ও মোঙ্গালদের পতন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের শুরুতে বাগদাদ পতনের পর মোঙ্গালদের অব্যাহত যুদ্ধাভিযান, তারপর তাদের শাম ও আরব উপদ্বীপ দখলের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাতারদের মোকাবিলায় কামিল আইয়ুবির পরিকল্পনা ও মায়াফারিকিনে[১] (সিলভান) তাঁর সাহসী প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর শাহাদাতবরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, নির্ভীক নগরী হিসেবে মায়াফারিকিনের সুখ্যাতি ছিল। কামিল আইয়ুবির নেতৃত্বে সেখানে ভয়াবহ এক রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধযুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশ্য শহরটিকে তাতাররা দীর্ঘদিন অবরোধ করে রাখায় অবরুদ্ধ আইয়ুবিদের সমস্ত রসদপত্র শেষ হয়ে যায়। তারা দুর্ভিক্ষ ও মহামারির শিকার হয়। মিনজানিকের মাধ্যমে মোঙ্গালদের নিক্ষিপ্ত বিশাল বিশাল পাথরের বিরামহীন আঘাতে দুর্গের প্রাচীরগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। একপর্যায়ে শহরের অধিকাংশ বাসিন্দা মৃত্যুবরণ করে।

[১] তুরস্কের প্রাচীন শহর। আধুনিক নাম সিলভান (Silvan)। শহরটি তুরস্কের দিয়ারবকর (Diyarbakır) প্রদেশে অবস্থিত।—সম্পাদক।

অবশেষে ৬৫৮ হিজরি—১২৬০ খ্রিস্টাব্দে জাজিরার[১] শেষ প্রতিরোধ-দুর্গটিরও পতন ঘটে। তাতাররা তখন বন্যার স্রোতের মতো শহরে প্রবেশ করে। মাত্র ৭০ জন অর্ধমৃত মানুষ ছাড়া সবাইকে তারা মৃত পড়ে থাকতে দেখে।

তারপর তারা কামিল আইয়ুবিকে গ্রেপ্তার করে। হালাকু খান তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত নৃশংস ও বর্বর আচরণ করে। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করার নির্দেশ দেয়। তাতাররা তাঁর গোশত টুকরো টুকরো করে হালাকুর মুখে তুলে দিতে থাকে। এভাবে একপর্যায়ে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। তারপর তারা তাঁর মাথা কেটে বর্শায় বিঁধে শহরব্যাপী প্রদক্ষিণ করে। এটি ৬৫৭ হিজরি মোতাবেক ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। এরপর তারা দামেশকে পৌঁছে বাবুল ফারাদিসে (Bab al-Faradis) তাঁর মাথা ঝুলিয়ে রাখে। পরে সেখানকার বাসিন্দারা এসে ফটক থেকে সেটি নামিয়ে দাফন করে।

শামের শাসক সুলতান নাসির আইয়ুবি তাতারদের বশ্যতা স্বীকার করে নেবেন নাকি প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন, এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কেননা, তারা তাঁকে চিঠির মাধ্যমে হুমকি দিয়ে আসছিল এবং বাগদাদ ও বাগদাদের খলিফার কী পরিণতি হয়েছিল, তা উল্লেখ করে তাঁকে ভয় দেখাচ্ছিল। সুলতান নাসিরের উদ্দেশে পাঠানো এক পত্রে তারা লিখেছিল—

> *আমরা বাগদাদের খলিফাকে এনে তাকে কয়েকটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি; কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে মিথ্যা বলে। তাই তাকে লাঞ্ছিত হতে হয়। আমরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। সে বহু ধনরত্ন জমা করেছিল; কিন্তু মূলত সে ছিল ইতর। সে নিজে অনেক সম্পদ জমা করলেও অন্যদের জন্য কিছু করেনি। মানুষকে সম্মান করতে শেখেনি। সর্বত্র তার সুনাম-সুখ্যাতি ও মর্যাদা ছড়িয়ে পড়ে; আর এটাই তার ধ্বংসের কারণ হয়। আমরা আল্লাহর কাছে এমন সুনাম-সুখ্যাতি থেকে পানাহ চাই। জনৈক কবি বলেন,*
>
> *যখন কোনো বিষয় চূড়ান্ত উৎকর্ষ লাভ করে*
> *তখন তার পতন ঘনিয়ে আসে।*
> *তুমি যখন কোনো বস্তুর পূর্ণতা লাভের কথা শুনবে*
> *তখন তার বিনাশের অপেক্ষা করো।*
> *কোনো নিয়ামত পেলে তার কদর করবে, পাপাচারে ডুব দিয়ো না।*
> *কেননা, পাপাচার মানুষের নিয়ামত ধ্বংস করে দেয়।*

[১] মধ্য-এশিয়ার উত্তরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ভূখণ্ড। এটি বর্তমান সিরিয়ার উত্তর-পূর্ব, ইরাকের উত্তর-পশ্চিম ও তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ছিল। আরবিতে এটাকে আল-জাজিরাতুল ফুরাতিয়া এবং ইংরেজিতে আপার মেসোপটেমিয়া (Upper Mesopotamia) বলা হয়। —সম্পাদক।

কত যুবক ভোগবিলাসিতায় গা ভাসিয়েছিল
তারপর হঠাৎ একদিন মৃত্যু এসে তাকে ছোবল মেরে নিয়ে যায়।

সুতরাং এই পত্র হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি তোমার সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও ধনসম্পদ নিয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের দরবারে ছুটে আসবে। তার বশ্যতা স্বীকার করে নেবে। তাহলে তুমি তার হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং তার আশীর্বাদ লাভ করবে—যেমনটি পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন—'মানুষ তার কৃতকর্মের ফলই লাভ করে; আর তার কাজ তাকে অচিরেই দেখানো হবে। তারপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে।' [সুরা নাজম : ৩৯-৪১]

'আর আমার দূতদের তোমার কাছে বন্দি করে রাখবে না, যেভাবে ইতিপূর্বে আটকে রেখেছিলে। হয় সদয়ভাবে রাখবে, নয়তো সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে।' [সুরা বাকারা : ২২৯]

আমরা জানতে পেরেছি, শামের ব্যবসায়ীরাসহ অন্য অনেকেই মিসর থেকে পালিয়ে গেছে। তারা যদি কোনো সুউচ্চ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে থাকে, তাহলে আমরা পাহাড়সুদ্ধ তাদের ধসিয়ে দেবো। যদি কোথাও ভূ-তলে আত্মগোপন করে থাকে, তাহলে সেখানেই পুঁতে ফেলব।

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের এ পদ্ধতিটি মোঙ্গালরা শত্রুদের বিরুদ্ধে খুব নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করত। এর মাধ্যমে প্রথমেই তারা শত্রুকে মানসিকভাবে কাবু করে মনোবল ভেঙে দিত।

যাইহোক, মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে মোঙ্গালদের যুদ্ধাভিযান অব্যাহত থাকে। তারা হালাব[৩] পদানত করে। দামেশক[৪] নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। শামে আধিপত্য বিস্তার করে। মুসলমানদের সঙ্গে পাশবিক ও বর্বরতামূলক আচরণ করে। অনুগত-অবাধ্য সবাইকে হত্যা করে। সিরিয়ার হালাব, দামেশক, হিমস,[৫] বালাবাক্ক,[৬] বানিয়াস[৭] ও অন্য অনেক অঞ্চল তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল; তবু তারা সেখানকার শাসনব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দেয়। সেখানকার দুর্গ, প্রাচীর ও মসজিদগুলোর চিহ্ন পর্যন্ত মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। সেখানে গণহত্যা চালায়। নৃশংসতা ও বর্বরতায় ক্রুসেডারদেরও

[৩] আধুনিক নাম আলেপ্পো। সিরিয়ার অন্যতম বড় শহর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ। এটি সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এবং রাজধানী দামেশক থেকে ৩১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।—সম্পাদক।

[৪] সিরিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তম নগরী। এটি একটি ঐতিহাসিক শহর।—সম্পাদক।

[৫] হিমস সিরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি শহর এবং হিমস প্রদেশের রাজধানী। আসি নদীর (Orontes River) তীরে এর অবস্থান।—সম্পাদক।

[৬] বর্তমান লেবাননের একটি শহর।—সম্পাদক।

[৭] সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমে তারতুস জেলার একটি শহর।—সম্পাদক।

ছাড়িয়ে যায়। ক্রুসেডাররা এতদিন চেষ্টা করেও এসব শহরে যা করে দেখাতে পারেনি, তারা তা করে দেখায়।

তারা নিকট-প্রাচ্যে[৮] যুদ্ধাভিযান পরিচালনার শুরু থেকেই প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টানদের আনুকূল্য লাভের চেষ্টা করে এবং খ্রিষ্টানদেরও যথেষ্ট আনুকূল্য দেয়। বিভিন্ন অঞ্চল বিজয়ের শুভ মুহূর্তে হালাকু খান খ্রিষ্টান রাজাদের পুরস্কৃত করে। তাদের উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণে সুলতান মালিক নাসির ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। ভয়ে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। শেষপর্যন্ত হালাকুর হাতে বন্দি হন। পরে হালাকু যখন আইন জালুতযুদ্ধে মোঙ্গালদের পরাজয়ের সংবাদ শুনতে পায়, তখন রাগে-ক্ষোভে তাঁকে হত্যা করে।

মোঙ্গালদের হাতে শাম ও তার মিত্রশক্তিগুলো পরাজিত হওয়ায় সিরিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করে। তাই তারা পালিয়ে মিসর অভিমুখে গমন করে। মিসরের মুসলিম শাসক তখন ইরাক ও শাম থেকে আসা মুসলিম মুহাজিরদের সাদরে গ্রহণ করেন এবং মোঙ্গালদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধাভিযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন। সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ তখন মিসরের উপসুলতান ছিলেন। মূল সুলতান ছিলেন আইবেকের নাবালক পুত্র ছয় বছর বয়সি আল মানসুর আলি ইবনুল মুয়িজ। কুতুজ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, এই উদীয়মান সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে হলে তাঁকে দুটি কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। একটি হচ্ছে, মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে মঙ্গোলিয়ার জান্তব তাতারদের নারকীয় আগ্রাসন রুখে দেওয়া। অপরটি হচ্ছে, মিসরের আলিমসমাজ, বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয়দের উপস্থিত করে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করা যে, নাবালক সুলতান আলি ইবনুল মুয়িজের পক্ষে মোঙ্গালদের সর্বপ্লাবী হামলার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। কুতুজ এ ব্যাপারে তাঁদের আশ্বস্ত করতে সমর্থ হন। তখন তাঁরা নাবালক সুলতানকে বরখাস্ত করে তাঁকে সুলতান হিসেবে গ্রহণ করেন।

যাইহোক, মোঙ্গালদের মোকাবিলার লক্ষ্যে তিনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জোট গঠনের পরিকল্পনা নেন। অত্যন্ত শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেন এবং বিরোধীদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি স্থাপন করেন। সকল মত ও পথের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে রাষ্ট্রে ইসলামি শরিয়ত প্রণয়ন করেন। শায়খ ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদুস সালামের শিক্ষা ও নীতি গ্রহণ করেন। হালাকু খানের পত্রের তিনি এক চরম উত্তর দেন। পত্র নিয়ে আসা দূতদের বন্দি করে কায়রোর প্রধান ফটকের সামনে নিয়ে যান। সেখানে নিয়ে তাদের

[৮] নিকট-প্রাচ্য (Near East) বলতে তুরস্ক, সিরিয়া, জর্ডান, মিসর ও তৎপার্শ্ববর্তী আরও কিছু অঞ্চলকে বোঝানো হয়ে থাকে। — সম্পাদক।

গর্দান কেটে ফেলেন। তারপর কর্তিত গর্দান কায়রোর বিখ্যাত প্রবেশদ্বার জুয়াইলার ফটকে (Bab Zuwayla) ঝুলিয়ে রাখেন। তবে দূতদের একটি শিশুকে হত্যা না করে নিজের গোলাম বানিয়ে নেন।

মিসরের মাটিতে মোঙ্গলদের মস্তক ঝুলানোর এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। এরপর শুরু হয় যুদ্ধের জন্য তাঁর প্রস্তুতি গ্রহণ। মুসলমানগণ সাইফুদ্দিন কুতুজের দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে অভাবনীয় এক ঐতিহাসিক বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন। তাঁদের এই বিজয়ের ফলে কার্যত শাম থেকে মোঙ্গলরা লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধে জয়লাভের পর দ্রুত মিসরে ফিরে যাওয়ার জন্য কুতুজ শাম তথা সিরিয়ার প্রশাসনিক দায়িত্ব বণ্টন করে দেন। সেখানকার শাসনকাঠামো সুবিন্যস্ত করেন। এরপর তিনি মিসরের উদ্দেশে রওনা করেন; কিন্তু ফেরার পথে রুকনুদ্দিন বাইবার্স কিছু মামলুক সেনা সঙ্গে নিয়ে কৌশলে তাঁকে হত্যা করেন। সুলতানকে ঠিক কী কারণে হত্যা করা হয়েছিল, তা নিয়ে অবশ্য ইতিহাসবিদদের অনেক মত আছে। গ্রন্থের যথাস্থানে সেসব মত নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

তারপর আরও কিছু বিষয় নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে ইতিহাসের বিখ্যাত আইন জালুতযুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের নেপথ্যে যে কারণগুলো সক্রিয় ছিল, সেগুলো নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কারণগুলো ছিল :

১. সুদৃঢ় নেতৃত্ব।
২. যোগ্য ব্যক্তিদের দায়িত্ব প্রদান।
৩. শক্তিশালী বাহিনী গঠন।
৪. ব্যাপক ভিত্তিতে জিহাদের প্রেরণা সৃষ্টি।
৫. যুদ্ধের সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ গ্রহণ।
৬. যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণের অসাধারণ যোগ্যতা।
৭. সাইফুদ্দিন কুতুজের দূরদর্শিতা ও তাঁর প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব।
৮. মামলুকদের মধ্যে বিজয়ী দলের বৈশিষ্ট্য ও গুণসমূহের উপস্থিতি।
৯. ক্রমপর্যায় নীতি ও প্রতিরোধপ্রকল্পের উত্তরাধিকার।
১০. আলিমদের পক্ষ থেকে সাহায্য ও তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ।
১১. দুনিয়াবিমুখতা।
১২. মোঙ্গল রাজপরিবারে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।
১৩. জালিম ও সীমালঙ্ঘনকারীদের ক্ষেত্রে আল্লাহর চিরন্তন বিধান ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, আইন জালুতযুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়লাভের একক কোনো কারণ ছিল না; বরং এর পেছনে অনেক কারণ সক্রিয় ছিল। সেগুলো আবার পরস্পর সংশিষ্ট ছিল। এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। অবশ্য উপরে বর্ণিত কারণগুলো ছাড়া আরও অনেক কারণ ছিল। ইতিহাসের গ্রন্থাবলি চষে আমার পক্ষে যেগুলো উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে, আমি শুধু সেগুলো উল্লেখ করেছি। তবে আগ্রহী কেউ চাইলে গবেষণা করে আরও অনেক কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারেন, যাতে আমরা কোনো রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠীর উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের নেপথ্যের কার্যকারণ খুঁজে বের করতে পারি এবং সেগুলো থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি; আর এভাবে আমাদের জ্ঞানের পরিধি আরেকটু বিস্তৃত করতে পারি। পাশাপাশি কোনো ভূখণ্ড জয় করতে বিজেতাদের যেসব বিচক্ষণতা, যোগ্যতা ও নেতৃত্বগুণ কার্যকারী ভূমিকা রাখে, সেগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারি এবং ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থে সেগুলো ব্যবহার করতে পারি।

আল্লাহ বলেন,

> তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। এটি এমন বাণী, যা মিথ্যা রচনা নয়; কিন্তু মুমিনদের জন্য এটি পূর্বগ্রন্থে যা আছে, তার সমর্থন ও সবকিছুর বিশদ বিবরণ; হিদায়াত ও রহমত। [সূরা ইউসুফ : ১১১]

তারপর আইন জালুতযুদ্ধে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের ফল ও প্রভাবসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে শুধু শিরোনামগুলো উল্লেখ করে দিচ্ছি :

১. মোঙ্গলদের দখল থেকে শাম পুনরুদ্ধার।
২. শাম ও মিসরে ঐক্য প্রতিষ্ঠা।
৩. মামলুকদের বিরোধী শক্তিগুলোর বিলুপ্তি।
৪. পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়।
৫. মানবেতিহাসের এক নিষ্পত্তিমূলক ঘটনা।
৬. মুসলিম উম্মাহর মধ্যে নবপ্রাণের সঞ্চার।
৭. মোঙ্গল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি রোধ।
৮. ক্রুসেডার ও তাতারদের মধ্যকার মৈত্রীচুক্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়া।
৯. কায়রোকে মামলুক সালতানাতের রাজধানী ঘোষণা।
১০. মামলুক সালতানাতের উত্থান।
১১. আব্বাসি খিলাফতের প্রতীকী শাসন।

১২. যুদ্ধোপকরণ ও ব্যবস্থাপনায় মামলুক সেনাবাহিনীর আরও উৎকর্ষসাধন করা।

মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমাকে অবশ্যই তাদের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হয়েছে। তখন আমি তাদের মিশনের প্রকৃতি, শক্তির উৎস ও দুর্বলতার দিকগুলো প্রত্যক্ষ করেছি। দেখেছি কীভাবে তারা মুসলিমবিশ্বের ওপর আদের তুফান হয়ে নেমে এসেছে। বুখারা-সমরকন্দ-কাবুল-বাগদাদসহ বহু সমৃদ্ধ নগরী বিধ্বস্ত জনপদে পরিণত করেছে। সেখানকার মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম হরণ করেছে। অপরদিকে তাদের শক্তি ও প্রতাপের মোকাবিলায় মুসলমানদের দুর্বলতা, নতজানু মানসিকতা ও এর নেপথ্যের কারণগুলোও গভীরভাবে লক্ষ করেছি।

সেই সঙ্গে লক্ষ করেছি, জালিমদের ব্যাপারে আল্লাহর চিরন্তন নীতি ঠিকই যথাসময়ে কার্যকর হয়েছে। তাদের সবাইকে তিনি কঠিন শাস্তি দিয়েছেন; কাউকে কোনো ছাড় দেননি। তাঁর নিয়মে কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়নি; কিন্তু তাঁর বিধান কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত মুসলমানদের (তাদের কৃতকর্মের কারণে) দুঃখ-দুর্দশা, হীনতা-দীনতা ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। অবশেষে তারা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে শক্তির বিস্ফোরণ ঘটেছে। মামলুক সালতানাতের অধীনে আবার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তারা গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছে, কীভাবে আল্লাহ তাকদিরকে তাকদির দিয়ে পালটা আঘাত করেন, যার ফলাফল ছিল আইন জালুতযুদ্ধে তাদের বিস্ময়কর সাফল্য।

এ যুদ্ধে সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ সম্পূর্ণরূপে ইসলামি নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করেন। সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অত্যন্ত সূক্ষ্ম সমরকৌশল ও শক্তিশালী সমরাস্ত্র ব্যবহার করেন। ফলে বিশ্বপরাশক্তিরূপে আবির্ভূত হওয়া মোঙ্গালদের তিনি সহজেই পরাজিত করতে সক্ষম হন। তুফানের বেগে ছুটে চলা তাদের অপ্রতিরোধ্য বিজয়রথ থামিয়ে দেন।

কুতুজের লক্ষ্য ও গন্তব্য ছিল স্পষ্ট। ব্যক্তিত্ব ছিল স্বচ্ছ। ধর্মীয় চেতনার শিখা ছিল প্রজ্বলিত। রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল পরিপক্ক। সমরশক্তি ছিল উন্নত। যেমন মানে, তেমনি গুণে। তিনি আলিমদের মর্যাদা ও ভূমিকা, জনগণের মধ্যে তাঁদের আত্মিক প্রভাব সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। ফলে তাঁদের কাছে টানেন। সম্মান করেন। যেকোনো প্রকার উপদেশ ও মত প্রদানে তাঁদের স্বাধীনতা দেন। আলিমদের জন্য তাঁর দ্বার সবসময় উন্মুক্ত রাখেন। এ কারণে দেখা যায়, আলিমগণ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁরা তাঁর ইসলামি মিশনে যোগদানের জন্য জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে এবং তাদের শীতল দেহে তপ্ত রক্ত ঢেলে দিতে বিরাট ভূমিকা পালন করেন।

নিশ্চয় এই উম্মাহর ইতিহাস হচ্ছে চেতনার অনিঃশেষ বিপ্লব, জ্ঞান ও সভ্যতার

অফুরন্ত ভান্ডার, যা আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, ইমান ও বিশ্বাসের মর্যাদা দান করে এবং মুমিন হওয়ার গৌরবে গৌরবান্বিত করে। শুধু তা-ই নয়; জ্ঞান ও সভ্যতার এই ভান্ডার আমাদের বর্তমান বিনির্মাণ, সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন ও ইসলামি সমাজব্যবস্থার আলোকে এমন একটি মহৎ জীবন গঠনে সাহায্য করে, যার পরতে পরতে থাকবে আত্মার অনাবিলতা, চিন্তার বিশুদ্ধতা ও ইবাদতের পরিশুদ্ধতা। ইসলামের শিক্ষা দ্বারা যে জীবন হবে সুসংহত এবং ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি হবে যে জীবনের সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়ার চালিকাশক্তি।

ইসলাম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা যেন অতীত নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করি। কিন্তু অতীতে ফিরে না যাই; বরং অতীত থেকে যেন সামনে এগোবার পাথেয় সংগ্রহ করি এবং গৌরবময় অতীত ও সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি করি। কিন্তু আমরা যদি অতীত নিয়ে শুধু গর্ব করি; আর পূর্বপুরুষদের সোনালি ইতিহাসের আলোচনায় বিভোর থাকি, তাহলে তা আমাদের মধ্যে একধরনের তন্দ্রাচ্ছন্নতা সৃষ্টি করবে। জাগ্রত ব্যক্তিকেও একসময় ঘুম পাড়িয়ে দেবে। আমাদের জীবনীশক্তি হ্রাস করবে। আবার যদি নিছক ভবিষ্যৎস্বপ্নে বিভোর থাকি, সেটাও আমাদের নির্বোধ সাব্যস্ত করবে এবং আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির বিলোপ সাধন করবে। অনুরূপ যদি বর্তমান নিয়ে মেতে থাকি, তাহলে তা আমাদের সক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ এবং অক্ষমতা ও অকর্মণ্যতাকে প্রকটরূপে তুলে ধরবে। আমরা বরং অতীত থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করব, ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য ও গন্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করব এবং বর্তমানকে খুঁটি ও ভিত্তি হিসেবে নেব।

আমরা সম্যকরূপে অবগত আছি যে, মুসলিম উম্মাহর হারানো গৌরব লেখালিখি, ভাষণ ও বক্তৃতার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। কেননা, স্বাধীনতার বুলি আওড়িয়ে কিংবা স্বাধীনতার সংগীত গেয়ে বেড়ি পরা কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে কখনো মুক্ত করা যায় না। এসব তার কোনো কাজে আসে না। অনুরূপ ক্ষুধার্ত বসে বসে অতীতের রসনাবিলাসের কথা মনে করলে তার ক্ষুধা কখনো নিবারিত হয় না। একসময়ের ধনী বসে বসে তার অতীত ধনাঢ্যতার কথা স্মরণ করলে তার দারিদ্র্য কখনো ঘুচবে না। লাঞ্ছিত ও অপদস্থ বসে বসে তার পূর্বপুরুষদের গৌরবগাথা রচনা করলে সে কোনোদিন তার লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাবে না।

তবে আমরা এ-ও জানি, যে কারাবন্দি তার স্বাধীন জীবনযাপনের কথা ভুলে গেছে, সে পরাধীনতাকেই ভালোবাসবে; মুক্তির পথ খোঁজার চেষ্টা করবে না। যে দরিদ্র তার অতীত ধনাঢ্যতার কথা ভুলে গেছে, সে তার দরিদ্রতা নিয়েই পরিতুষ্ট থাকবে; সচ্ছলতা লাভের চেষ্টা করবে না। যে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষদের মর্যাদা ও

গৌরবের কথা ভুলে গেছে, সে তার অপদস্থ জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে; মর্যাদা ও গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে না।

সুতরাং আমরা যদি আমাদের গৌরবময় অতীত নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি, সারা দিন শুধু সেসবের স্মৃতিচারণ করি, কলমের আঁচড়ে তুলে আনি কিংবা বক্তৃতায় উল্লেখ করি, তাহলে কিছুতেই আমরা আমাদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারব না। বিশ্বনেতৃত্বের আসনে আবার আমরা নিজেদের অধিষ্ঠিত করতে পারব না।

এভাবে আমরা যদি ভুলে যাই যে, আমরা পৃথিবীর শাসক ও জগদ্‌গুরুদের বংশধর, তাহলে এই হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে কোনোকিছুই আমাদের আবেগ-অনুভূতিকে আন্দোলিত করতে পারবে না। কাজেই অতীতের যেসব বিষয় আমাদের ভবিষ্যৎপানে অগ্রসর হতে প্রেরণা জোগাবে এবং যা মহৎ ও কল্যাণকর, আমরা শুধু সেসব গ্রহণ করব। পক্ষান্তরে অতীতের যেসব বিষয় আমাদের কর্মোদ্যম নষ্ট করে ও স্নায়ুতে তন্দ্রাভাব এনে দেয়, আমরা সেগুলো সচেতনভাবে বর্জন করব। কেননা, আমরা কিছুতেই অতীতে ফিরে যেতে চাই না। কারণ, সময় কখনো থেমে থাকে না এবং যে সময়টা চলে যায়, তা আর ফিরে আসে না। তা ছাড়া আমাদের পক্ষে বর্তমানের আধুনিক জীবনোপকরণ ছেড়ে অতীতের জীবনধারায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা চাইলে আত্মপ্রত্যয়, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের উন্নত আদর্শ, নৈতিকতা ও মহৎ গুণগুলো অর্জন করতে পারি। কেননা, এসব আদর্শ ও গুণ স্বর্ণবৎ ও মণিমুক্তাতুল্য; সময়ের ব্যবধানে ও কালের বিবর্তনে যা কখনো তার মূল্য হারায় না। লোহার মতো মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে যায় না। চিরমূল্যবান।[৮]

আমরা ইমান, তাকওয়া, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা ও পরিশুদ্ধ ইবাদতে সমর্পিত জীবনে ফিরে যেতে চাই। ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে চিরন্তন জীবনবিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাই। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার শিরক থেকে পবিত্র থাকতে চাই এবং মহান আল্লাহর এই বাণী অনুযায়ী নিজেদের পরিচালিত করতে চাই—

> তোমাদের যারা ইমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদের অবশ্যই নিরাপত্তা দান

[৮] *ফুসুল ফিদ দাওয়াতি ওয়াল ইসলাহ* : ১৪।

> করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কোনোকিছু শরিক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারা তো সত্যত্যাগী। তোমরা সালাত কায়িম করো, জাকাত আদায় করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পারো। [সুরা নূর : ৫৫-৫৬]

মুসলিম উম্মাহ যদি নিজেদের মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টি ও সমকালীন যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে চায়, তাহলে অবশ্যই সামরিক শক্তির পাশাপাশি অন্যান্য শক্তি অর্জন ও চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে সামরিক শক্তি অর্জনের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহকে শক্তি অর্জনের সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, আল্লাহর দীন পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করতে শক্তি অর্জন একটি মাধ্যম। পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা যেমন আবশ্যক, তেমনি তার জন্য শক্তি ও উপায়-উপকরণ গ্রহণ করাও আবশ্যক। কারণ, শাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন, যা ছাড়া কোনো অবশ্যকর্তব্য পালন করা যায় না, তা গ্রহণ করাও আবশ্যক। কাজেই আমাদের পূর্ণ শক্তি অর্জন করতে হবে। এটি আমাদের প্রতি মহান আল্লাহর নির্দেশ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

> তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এর মাধ্যমে সন্ত্রস্ত করবে তোমাদের ও আল্লাহর শত্রুকে এবং এরা ছাড়া অন্যদের, যাদের তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদের জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু খরচ করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। [সুরা আনফাল : ৬০]

অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে মুসলমানদের সমরশক্তিতে বলীয়ান হওয়া অত্যধিক প্রয়োজন। কেননা, বর্তমানে তাদের এমন বৈশ্বিক নীতি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে, অস্ত্র ও শক্তির ভাষা ছাড়া যারা অন্য কোনো ভাষা বোঝে না। তাই তাদের অস্ত্রের মোকাবিলা অস্ত্র দিয়েই করতে হবে। সাধারণ বায়ুর মোকাবিলায় টর্নেডো হতে হবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে ভয়ংকর মারণাস্ত্রসমৃদ্ধ হতে হবে এবং শত্রুর দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ত্রুটি ও অবহেলার সুযোগ নেই।[১০]

এবার মামলুক সম্প্রদায়ের আলোচনায় আসি। মামলুক সম্প্রদায়ের সেনাপতিগণ নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহর সামনে বীরত্ব, সাহসিকতা ও প্রাণোৎসর্গের মহাকাব্য রচনা করে গেছেন। তাঁরা তাঁদের শাসনামলে ইউরোপীয় ক্রুসেডার ও পূর্ব-এশিয়ার মোঙ্গলদের মতো এমন ভয়ংকর ও রক্তোন্মাদ দুটি অপ্রতিরোধ্য বিশ্বশক্তির মোকাবিলা

[১০] *ফিকহুন নাসরি ওয়াত তামকিনি ফিল কুরআনিল কারিম* : ১২৩-২২৪।

করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যারা ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিকভাবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে নিজেদের ভোগে পরিণত করতে চেয়েছিল; কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। লক্ষ্য অর্জনে তারা সফল হয়নি। কারণ, মামলুকগণ মুসলিম দেশ এবং নিজেদের দীনধর্ম ও নৈতিকতা রক্ষায় তাদের সামনে বাধার দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

মামলুকদের এ যুদ্ধ শুধু যে নিজেদের অস্তিত্ব ও সাম্রাজ্য রক্ষার লড়াই ছিল, তা নয়; বরং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল জিহাদ। এটি তাঁদের সর্বোত্তম নেক আমল ছিল। সেই সঙ্গে তাঁদের এ যুদ্ধ ইসলামি ইতিহাসের এক মহাকাব্য ছিল। মুসলিম উম্মাহ আজও যদি তাদের হারানো আত্মবিশ্বাস, গৌরব ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে চায়, তাহলে মামলুকদের কীর্তি ও বীরত্বগাথা তাদের পথ দেখাবে। তারা তাঁদের ইতিহাস পড়ে দিক-নির্দেশনা লাভ করবে। কেননা, মামলুকরা যুদ্ধের ময়দান ও রাজনীতির অঙ্গনে তাঁদের যোগ্যতা, বীরত্ব ও সাহসিকতার কিছু অমর কীর্তি রচনা করে তখনকার মুসলিমবিশ্বের শাসক ও জনগণ সবার কাছ থেকে মর্যাদা ও সমীহ আদায় করে নেন। বিধর্মী অন্য রাষ্ট্রগুলোর অন্তরাত্মায় মুসলিমভীতি ছড়িয়ে দেন। তাই তারা মামলুকদের আক্রমণ ও রোষের শিকার হওয়া থেকে বাঁচতে তাঁদের সঙ্গে তোষণনীতি গ্রহণ করে। এভাবে মামলুকরা শত্রু-মিত্র সবার সমীহ আদায় করে নেন। সবাই তাঁদের সুদৃষ্টি লাভের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। যার ফলে কায়রো বিরাট একটি রাজনৈতিক চাঞ্চল্য প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয়।

অনেক ইতিহাসবিদ ও গবেষক মামলুকদের ইতিহাসের এই উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের যেমন প্রশংসা করেছেন, তেমনি বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। তারা এই যুগকে মুসলমানদের অবক্ষয় ও অধঃপতন, পশ্চাৎপদতা ও স্থবিরতা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বন্ধ্যাত্ব ও চর্বিতচর্বণের যুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ছাড়া প্রাচ্যবিদরা মামলুকদের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েও অভিযোগ তুলেছেন। তবে ঐতিহাসিক সত্য হলো, মুসলিমবিশ্বে মামলুকদের যুগেই সবচেয়ে বড় বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের সূচনা হয়।

ফরাসি প্রাচ্যবিদ গ্যাস্টন উইট (Gaston Wiet) এই বুদ্ধিবৃত্তিক কাজকে দ্বিতীয় শ্রেণির বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, ইতিহাসের কোনো কালেই কায়রো জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ মানের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত ছিল না; যেমন বাগদাদ ও কর্ডোভা ছিল। তবে হিজরি অষ্টম ও নবম শতক মোতাবেক খ্রিষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে কায়রো একটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। বিশেষ করে কায়রো তখন বিশ্ববাণিজ্য-কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এতৎসত্ত্বেও কায়রো তার শিল্পচর্চার উন্নত রুচি ধরে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে কায়রোর এই চর্চা ছিল দ্বিতীয় স্তরের।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ কার্ল ব্রুকেলম্যান (Carl Brockelmann) বলেন, মামলুকদের যুগের জ্ঞানমূলক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সৃষ্টিকর্মে মৌলিকত্ব ও অভিনবত্বের কোনো ছাপ নেই বললেই চলে।[১১]

তবে দুঃখের বিষয় হলো, অনেক মুসলিম গবেষক—তন্মধ্যে আরবের কজন গবেষকও আছেন—মামলুকদের অবদানকে প্রাচ্যবিদদের মতো খাটো দৃষ্টিতে দেখেন। শুধু তা-ই নয়, এ ক্ষেত্রে অমুসলিম প্রাচ্যবিদদের গবেষণার প্রতি মুগ্ধতাও প্রকাশ করেন তারা; এমন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত তাদের হৃদয়!

এ সকল মুসলিম গবেষকের অধিকাংশের গবেষণাতেই মূলত অমুসলিম প্রাচ্যবিদদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। সত্যিকারার্থে এগুলো বস্তুনিষ্ঠ কোনো গবেষণা হয়নি, যাতে বিশেষ কোনো জ্ঞান-গবেষণার ছাপ লক্ষ করা যায়। ফিলিপ কে. হিট্টি (Philip K. Hitti) ও অন্যান্য প্রাচ্যবিদের মূলনীতি অনুসরণ করে চলা এ সকল গবেষকের গবেষণা সংগত কারণেই বস্তুনিষ্ঠ হয়নি। এগুলোতে সম্পূর্ণরূপে কার্ল ব্রুকেলম্যানের মতের প্রতিফলন ঘটেছে, যিনি মামলুক যুগকে মৌলিক ও অভিনব সৃষ্টিশূন্য বলেছেন। আর কারও কারও গবেষণায় গ্যাস্টন উইটের মতের প্রতিফলন ছিল, যিনি মামলুকদের অবদানকে এমন খাটো চোখে দেখেছেন যে, আমার মনে হয় কোনো গবেষক যদি প্রায় তিন শতাব্দীব্যাপী শাসন করা মামলুকদের ওপর তার গবেষণাকর্ম শুধু *মুকাদ্দামা ইবনু খালদুনের* ওপর সীমাবদ্ধ রাখতেন, তাহলেই তিনি আর গ্যাস্টন উইটের বক্তব্যকে পাত্তা দিতেন না। অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ মূর্খতা কিংবা বিদ্বেষ অথবা উভয়টির শিকার হয়ে মামলুক যুগকে অধঃপতন, অবক্ষয় ও স্থবিরতার যুগ বলে কলুষিত করার চেষ্টা করেছেন। দুঃখের বিষয় হলো, এ ক্ষেত্রে আমাদের ঘরানার অনেক গবেষক—যাদের আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুসারী মনে করা হয়—তাদের ছায়া মাড়িয়েছেন। তাদের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন; আর মামলুক যুগকে পশ্চাৎপদতা, অধঃপতন, অরাজকতা ও অবক্ষয়ের যুগ বলে মিথ্যা অপবাদ আরোপের ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালিয়েছেন।

বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ মামলুকদের প্রতি বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এই বক্তব্য দিয়েছেন। কেননা, ক্রুসেডাররা তাঁদের হাতে চরম মার ও ধাওয়া খেয়ে শাম থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়; পরবর্তী সময়ে তাঁদের মুখোমুখি হয়ে মোঙ্গালদেরও কোমর ভেঙে গিয়েছিল এবং বেদখল হওয়া গোটা শাম ও সেখানকার পবিত্র ভূমিগুলো তাঁরা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। হিজাজের স্বাধীনতা ফিরিয়ে এনেছিলেন। পরবর্তী প্রায় তিন শতাব্দী এসব অঞ্চল তাঁদের সে অবদানের সুফল ভোগ করেছে।

[১১] *তারিখুশ শুউবিল ইসলামিয়া* : ৩৭১।

একজন গবেষক যদি ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে মামলুকদের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই দেখতে পাবেন মামলুক যুগ আদৌ অধঃপতনের যুগ ছিল না; বরং তাঁদের শাসনামলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। বস্তুত মামলুক যুগ ছিল ইসলামি স্থাপত্যশিল্পের সোনালি যুগ। সহস্র মসজিদের শহরখ্যাত কায়রোর দিকে তাকালে এই ঐতিহাসিক সত্য আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। কায়রোতে রয়েছে বিমারিস্তান মানসুরি[১২] থেকে শুরু করে সুলতান হাসান জামে মসজিদ, বাইবার্সের খানকা, সুলতান আইবেক মসজিদ, ঘুরি ইত্যাদি আরও অনেক জামে মসজিদ।[১৩] কারুকার্যশোভিত এসব মসজিদ ও সেসবের আজানখানার বিশালতা ও নান্দনিকতা দর্শকদের চোখে সত্যিই বিস্ময় ও মুগ্ধতা সৃষ্টি করে।

শুধু কায়রো নয়, দামেশকেও মামলুকদের হাতে নির্মিত অসংখ্য স্থাপত্য-নিদর্শন ইসলামি ইতিহাসের সমুজ্জ্বল অধ্যায়ের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন : মাদরাসায়ে জাহিরিয়া ও তার পাশে অবস্থিত মাদরাসায়ে জাকমাকিয়া। সেখানে আরও একটি নান্দনিক স্থাপত্য-নিদর্শন রয়েছে, সেটি হচ্ছে জামে উমাইয়া মসজিদের পশ্চিম দিকের আজানখানা। ৮৮৪ হিজরিতে মসজিদটি পুড়ে যাওয়ার পর সুলতান কাইতবাইয়ের (Qaitbay) নির্দেশে এটি পুনর্নির্মিত হয়। এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে কয়েক মাস লেগে যায়।

স্থাপত্যশিল্পের পাশাপাশি মামলুকদের যুগে জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। এ সময় সাহিত্য, ইতিহাস, তাফসির, ফিকহ, হাদিস ও অন্যান্য শাস্ত্রে বড় বড় বিশ্বকোষ রচিত হয়। ফিকহ ও হাদিসের ক্ষেত্রে ইমাম নববি, ইবনু তাইমিয়া, ইবনু রজব হাম্বলি, বাদরুদ্দিন আইনি ও ইবনু হাজারের মতো জগদ্‌বিখ্যাত জ্ঞানীগণ বিশাল বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলো সবই মামলুক যুগে রচিত ও বিশ্বকোষের মানে উন্নীত। অনুরূপ ইতিহাসশাস্ত্রে রয়েছে শারফুদ্দিন ইউনিনি, আলামুদ্দিন বিরজালি, ইবনু কাসির, ইবনু খালদুন, ইবনু তাগরি বারদি ও শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নুওয়াইরির মতো মনীষীদের বিস্ময়কর গবেষণাকর্ম। এ ছাড়াও ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ে রয়েছে ইবনু ফাজলুল্লাহ শিহাবুদ্দিন আমরির

---

[১২] 'বিমারিস্তান' একটি ফার্সি শব্দ। অর্থ : চিকিৎসালয়, হাসপাতাল। 'বিমারিস্তান মানসুরি' হাসপাতালটি মামলুকদের হাতে ত্রয়োদশ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয়। মামলুক সুলতান মানসুর কালাউন এ হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাই এটিকে আল মানসুরি বলা হয়। এটি শুধু হাসপাতালই নয়; বাহরিয়া মামলুকদের হাতে নির্মিত স্থাপত্যশিল্পের এক অনন্য নিদর্শনও। এটি একটি বিশাল উদ্যোগ ছিল। এখানে নারী-পুরুষ, স্বাধীন-ক্রীতদাস, এককথায় সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষ চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে পারত। হাসপাতালটি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল; শুধু সমাজের বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। উল্লেখ্য, সুলতান মানসুর হলেন বাহরিয়া মামলুক সালতানাতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ইতিহাসবিখ্যাত সুলতান রুকনুদ্দিন জাহির বাইবার্সের উত্তরসূরি। — অনুবাদক।

[১৩] *আল-আসরুল মুফতারা আলাইহি আসরুল মামালিকিল বাহরিয়া* : ১৩।

মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার, আবুল আব্বাস কালকাশান্দির[১৪] *সুবহুল আ'শা*, তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনু আলি মাকরিজির *খুত্বাতুল মাকরিজিস*হ অন্যান্য বিশাল গ্রন্থ।

এ সকল মনীষী ইসলামি জ্ঞানের ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি তাতে অনেক কিছু সংযোজন ও নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করেন। তারপর জ্ঞানের সেই অফুরন্ত ভান্ডার আমাদের হাতে তুলে দিয়ে যান। ফলে আজ আমরা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে পারছি এবং আধুনিক কালের কায়রোর গোড়াপত্তন যে মামলুকদের হাতেই হয়েছিল; আর তাঁদের সময়েই যে কায়রো রাজনৈতিক সক্ষমতার পাশাপাশি সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেছিল, সে সম্পর্কে জানার পরিধি বিস্তৃত করতে পারছি।

স্থাপত্যশিল্প, জ্ঞানবিজ্ঞান আর শিল্প-সাহিত্যের বাইরেও মামলুক সভ্যতার আরও একটি দিক রয়েছে, যা অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সেটি হলো তাঁদের সামরিক শক্তির দিক। মাত্র এক বছর যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে তাঁরা সুদীর্ঘ ৪৪ বছরব্যাপী (৬৫৮-৭০২ হিজরি) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মোঙ্গল ও ক্রুসেডাররা মুসলিমবিশ্বে যে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠন চালিয়ে আসছিল, তা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর অভূতপূর্ব এ অর্জন তাঁরা তাঁদের অসমসাহসিকতা, আকিদা-বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং স্থাপত্য ও সমরশক্তিতে উৎকর্ষ সাধনের কল্যাণে লাভ করেছিলেন। সমরশক্তির এই উৎকর্ষের কল্যাণেই মুসলমানরা ফিলিস্তিনের আক্কা (Acre) স্বাধীন করতে পেরেছিলেন। আর এটি ছিল মুসলমানদের জন্য একটি সুস্পষ্ট বিজয়, যে বিজয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কোনোক্রমেই পরবর্তী সময়ে বিজিত কনস্টান্টিনোপলের চেয়ে কম নয়। খোদ পশ্চিমারাও এ কথার সাক্ষ্য দেয়।

মামলুক সাম্রাজ্য মূলত আইয়ুবি ও তাঁদের পূর্ববর্তী অন্য শাসক ও মুসলিম সম্রাটদের সাম্রাজ্যেরই বিস্তৃত রূপ। এ হিসেবে আমরা বলতে পারি, মামলুক সাম্রাজ্য ঐতিহ্যবাহী সভ্যতার ধারক। তবে তাঁদের অধিকাংশ শাসক ছিলেন অনারব। সাধারণ মুসলমানরা যে যুদ্ধে অংশ নিতে ভয় পেত, তাঁরা তাতে নেতৃত্ব দিতেন। তবে অনেক গবেষক এই ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়েছেন যে, ৬৫৬ হিজরি—১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গল কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের মাধ্যমে ইসলামি সভ্যতার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তি ঘটে। তাই তারা মামলুক যুগের কীর্তি ও অবদানের কথা জানার চেষ্টা করেন না; অথচ এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। তাদের এই ভ্রান্তি দূর করতে দীর্ঘ আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী গ্রন্থগুলোতে আমরা এই ভ্রান্তির নিরসন করব। সেই সঙ্গে মামলুক যুগের

[১৪] মৃত্যু ৮২১ হিজরি মোতাবেক ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দ।

মনীষী এবং তাঁদের জ্ঞানমূলক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করব।

নিশ্চয় এই উম্মাহ হলো মানবজীবনের স্পন্দন। তারা কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম। ইতিহাসের অনেক ঘটনার দ্বারা এ সত্যটি আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, ভীষণ বিপদ ও কঠিন দুঃসময়ে তাদের ভেতরের সুপ্ত শক্তি বিস্ফোরিত হয়। তাদের সমস্ত শক্তি পুঞ্জীভূত হয়, সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয় এবং শোণিতধারা টগবগ করতে থাকে। তারা তখন সুদৃঢ় ইমান ও অবিচলতার মাধ্যমে অনায়াসেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এবং কঠিন বিপদ মোকাবিলা করতে পারে। এভাবে একপর্যায়ে আল্লাহ রাতের অন্ধকার সরিয়ে ভোরের উজ্জ্বল আলো পরিস্ফুট করেন।

সাহাবিগণ ও তাঁদের আসমানি বিজয়যাত্রা এবং উত্তমরূপে তাঁদের আদর্শ অনুসরণকারী তাবিয়িগণকে আমরা দেখেছি। তাঁদের মধ্যেও মুসলমানদের এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো সক্রিয় ছিল। এরপর যখন ক্রুসেডার ও মোঙ্গালবাহিনী মুসলিমবিশ্বের ওপর আক্রমণ চালায়, তখন সেলজুক, জিনকি, আইয়ুবি ও মামলুকরা তাদের মোকাবিলা করেন। ইসলামই ইমাদুদ্দিন, নুরুদ্দিন, সালাহুদ্দিন, সাইফুদ্দিন, রুকনুদ্দিনের মতো মহান সেনাপতি ও তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে জিহাদের চেতনা জাগ্রত করেছে।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মুসলমানদের মধ্যে এই যে অনিঃশেষ চেতনা, কবি হাশিম রিফায়ির চমৎকার একটি কবিতায় তা এভাবে বাঙ্ময় হয়েছে—

আমি মুসলিম, আমি মুসলিম।
এটি আমার হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে ওঠা সংগীত
হৃদয়ের গহীন থেকে আমি যার সুমধুর সুরলহরি শুনতে পাই।
আমার অন্তরাত্মা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও রক্তধারা
এক কথায় আমার সর্বসত্তা তখন তার সাথে সুর মেলায়।
এবং হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী ও ব্যাকুল হয়ে
গেয়ে ওঠে আমি মুসলিম, আমি মুসলিম।
যদিও হিংসুকরা আমাকে হিংসা করে।
এই তো আমি এখানে,
সুস্পষ্ট সত্যের ঘাঁটিতে শরিয়তের ওপর দাঁড়িয়ে আছি।[১৫]

অপর এক কবি বলেন,

তুমি কি ভেবেছিলে তোমার এক আঘাতেই আমার ধর্মের দাওয়াত মিটে যাবে?

[১৫] *সালাতুল উম্মাহ ফি উলুয়্যিল হিম্মাহ* : ৬/৫১২।

তোমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বড় নিকৃষ্ট ধারণা ছিল তোমার।

তোমার চাবুক ছিঁড়ে গেছে; অথচ আমার মনোবল এখনো কোষমুক্ত তরবারির মতো ধারালো ও তীক্ষ্ণ।

আল্লাহর কসম! জুলুম এক মুহূর্তের জন্যও দীনের দাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না।

ইতিহাসের পাতায় পাতায় আমার এ কসমের অনেক সত্যতা রয়েছে।

আমার হাতে তুমি বেড়ি পরাও, চাবুকের আঘাতে আমার হাড়-পাঁজর সব ভেঙে দাও, আমার গলায় ছুরি চালাও,

তবু তুমি মুহূর্তের জন্যও আমার চেতনা রুদ্ধ করতে পারবে না; কিংবা আমার ধর্মবিশ্বাস ও ইমানের নুর ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

কারণ, এই নুর আমার অন্তরে; আর আমার অন্তর আমার রবের হাতে। তিনিই আমার সাহায্য-সহযোগিতাকারী।

আমি আমার বিশ্বাসের রজ্জু আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকব এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নেব।

নিশ্চয় যাঁরা জীবনবাজি রেখে, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নেমেছিলেন এবং মোঙ্গল ও ক্রুসেডারদের নাগপাশ থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্র, শহর ও দুর্গ ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা সবাই সঠিক ইসলামি মিশনের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। সেই সঙ্গে বহিঃশত্রুদের মিশন ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ফলে তাঁরা অত্যন্ত সফলভাবে শত্রুর ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে সমর্থ হন এবং এ ক্ষেত্রে অসীম সাহসিকতা ও পর্বতসম দৃঢ়তার পরিচয় দেন। সুতরাং কোনো জাতি যদি হোঁচট খেয়ে আবার উঠে দাঁড়াতে চায়, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে তাদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির স্মৃতিচারণ করতে হবে এবং সেসব ঘটনার মূলে যে শিক্ষা, উপদেশ ও কর্মপন্থা রয়েছে, সেগুলো আহরণ করে যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে; তবেই তাদের বর্তমান সমৃদ্ধ ও ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল হবে। কেননা, বিভিন্ন রাষ্ট্র, জাতি ও জনগোষ্ঠীর ইতিহাসের ভেতর দিয়ে গবেষক, সেনানায়ক, রাজনীতিক, শাসকসহ সকল শ্রেণির মানুষের সামনে পূর্ববর্তীদের জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়। এই জীবনচিত্র যদি তারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে তাদের পক্ষে বর্তমানকে পরিবর্তন ও ভবিষ্যৎকে সমুজ্জ্বল করা অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে।

ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণেই দেখা যায়, যে জাতি ইতিহাস পড়ে না, তারা পৃথিবীর বুকে আল্লাহর চিরায়ত নিয়ম ও চিরন্তন বিধান সম্পর্কে জানতে এবং

তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতে পারে না।

যেকোনো আন্দোলনের সফলতার জন্য ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা অপরিসীম। এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই মানবেতিহাসের কোনো আন্দোলনকে ভাষা ও সাহিত্য উপেক্ষা করে সফলতা লাভ করতে দেখা যায় না। কেননা, লেখক, বক্তা ও আন্দোলনের প্রাণপুরুষগণ ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের মনোভাব জনগণের সামনে তুলে ধরে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেন। এভাবে একটি আন্দোলন সফলতা ও সার্থকতা লাভ করে। তা ছাড়া সংলাপ, সংঘাত, সংগ্রাম, প্রতিরোধ ও অধিকার আদায়ের বিশ্বে কোনো আন্দোলনকে সফলতার বন্দরে পৌঁছাতে এবং কোনো মিশন কিংবা এজেন্ডা বাস্তবায়নে উপকারী গ্রন্থাদি রচনার ভূমিকাও অপরিসীম। বর্তমান বিশ্বে এটিকে চিন্তা-দর্শন, ধর্ম-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আদর্শ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষামাধ্যম বিবেচনা করা হয়। কখনো কখনো এই প্রতিরক্ষার গুরুত্ব রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিরক্ষার গুরুত্বকেও ছাড়িয়ে যায়।

উচ্চাভিলাষী ও সম্প্রসারণবাদী যেকোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের পেছনে ধর্ম-বিশ্বাস, চিন্তা-দর্শন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সক্রিয় থাকে। এগুলো আন্দোলনে প্রাণের সঞ্চার করে। ভাষা ও সাহিত্য শানিত তরবারির ভূমিকা পালন করে; আর বইপুস্তক সেই তরবারি ধারণকারী সৈন্যের ভূমিকা পালন করে। ফলে ভাষা ও সাহিত্যের সামনে অনেক সময় সামরিক শক্তিকেও হার মানতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা ক্রুসেড সম্পর্কে, সেলজুক, জিনকি ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবির শাসনকাল সম্পর্কে এবং চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ক্রুসেড-আক্রমণ সম্পর্কে রচিত গ্রন্থসমূহে; আর আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ের এমন অসংখ্য প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাব, সামরিক ও পেশিশক্তির মাধ্যমে যেগুলো কখনোই সমাধান করা সম্ভব ছিল না।

মামলুকদের ইতিহাসের এ অধ্যায়টি অবশ্যই এ কথার একটি সন্তোষজনক ঐতিহাসিক দলিল যে, মুসলমানদের মধ্যে যদি নিয়তের বিশুদ্ধতা, ইমান ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা, দায়িত্বের প্রতি সচেতনতা, মেধার তীক্ষ্ণতা, সভ্যতার উৎকর্ষ ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে যেকোনো সময় তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারে এবং পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে তাকে উন্নত ও সভ্য নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে। মানুষকে মানুষের উপাসনা থেকে বের করে স্রষ্টার ইবাদতের দিকে টানতে পারে। সংকীর্ণ পৃথিবী থেকে প্রশস্ত জগতের দিকে এবং ধর্মের অবিচার থেকে ইসলামের ন্যায় ও ইনসাফের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

গ্রন্থটি আমি ১৭ সফর ১৪৩০; ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, বৃহস্পতিবারে সমাপ্ত করেছি। শুরু থেকে শেষ সারাটাই আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন কাজটি কবুল করেন, এ থেকে মানুষকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দেন এবং তাঁর দয়া-অনুগ্রহে এতে বরকত দান করেন। আল্লাহ বলেন,

> আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন, তা আটকে রাখার কেউ নেই। আর তিনি যা আটকে রাখেন, তারপর তা ছাড়াবার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা ফাতির : ২]

আমি মহান প্রভুর দয়া ও অনুগ্রহ স্মরণ করে আমার নড়াচড়া, স্থিরতা, জীবন-মরণ প্রতিটি পদক্ষেপ একান্তভাবে তাঁর কাছে সোপর্দ করা ছাড়া গ্রন্থটি সমাপ্ত করা সম্ভব হতো না। আল্লাহই আমার স্রষ্টা, তিনি অনুগ্রহকারী, তিনি মহান, তিনি সম্মানিত, তিনি সাহায্যকারী, তিনি মহান উপাসক এবং তিনিই তাওফিকদাতা। তিনি যদি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন, আমাকে আমার বোধশক্তি ও সত্তার ওপরই ছেড়ে দিতেন, তাহলে আমার বোধশক্তি আমাকে ছেড়ে চলে যেত, স্মরণশক্তি উধাও হয়ে যেত, আঙুলগুলো শক্ত হয়ে যেত, জোড়াগুলো শুষ্ক হয়ে যেত, আমি অনুভূতিহীন হয়ে যেতাম, কলম লিখতে অক্ষম হয়ে যেত।

হে আল্লাহ, আমাকে আপনার পছন্দনীয় বিষয়গুলো দেখান এবং সেগুলোর জন্য আমার হৃদয় খুলে দিন। আর আপনার অপছন্দনীয় বিষয়গুলো থেকে আমাকে দূরে রাখুন এবং আমার হৃদয় ও চিন্তাচেতনা থেকে সেগুলো সরিয়ে দিন। আপনার সুন্দর নাম ও উত্তম গুণাবলির দ্বারা আপনার কাছে চাচ্ছি। আমার কাজ একনিষ্ঠভাবে আপনারই জন্য। সেটা মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। আমি যা লিখেছি এর প্রতিটি বর্ণের বিনিময়ে আমাকে সাওয়াব দিন এবং আমার সাওয়াবের পাল্লায় সেগুলো রেখে দিন। এ গ্রন্থ পূর্ণতায় পৌঁছাতে যে-সকল ভাই-বন্ধু সহায়তা করেছেন, সবাইকে আপনি উত্তম বিনিময় দিন। আপনি না চাইলে এটা অস্তিত্বে আসত না, মানুষের মধ্যে প্রচারও হতো না।

যত মুসলমান গ্রন্থটি সম্পর্কে জানেন সবার কাছে আমার আবেদন, আপনাদের দুআ ও মাগফিরাত কামনায় এ অসহায় বান্দাকে ভুলবেন না। আল্লাহ বলেন,

> হে আমার রব, আপনি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য আমাকে আপনার শুকরিয়া আদায় করার তাওফিক দিন। আর আমি যাতে এমন সৎকাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন। আর আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। [সূরা নামল : ১৯]

আমি এ গ্রন্থটি আল্লাহর এ বাণী দিয়ে শেষ করেছি,

> হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ইমান নিয়ে আমাদের আগে অতিক্রান্ত হয়েছেন, তাদের ক্ষমা করুন এবং যারা ইমান এনেছিলেন, তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু। [সূরা হাশর : ১০]

প্রভুর ক্ষমা, অনুগ্রহ, রহমত ও সন্তুষ্টির প্রত্যাশী
আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবি

তৃতীয় অধ্যায়

মামলুক সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন

- মামলুকদের মর্যাদাবৃদ্ধি ও উচ্চ পদপ্রাপ্তি
- মামলুকদের রাজত্বে শাজারাতুদ দুর ও ইজ্জুদ্দিন আইবেক

প্রথম পরিচ্ছেদ

মামলুকদের উৎস ও উত্থান

এক. মামলুক কারা

মামলুক শব্দের বহুবচন মামালিক। পূর্ববর্তী যুগ থেকেই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যাদের বেচাকেনা ও সেবাগ্রহণ করা হতো, সেই দাসশ্রেণিকেই বলা হয় মামলুক। উমাইয়া শাসকদের যুগে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ইসলামি সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর সহযোগিতা করেছিল তুর্কি দাসরা। ইমাম তাবারি রাহ. বর্ণনা করেছেন, খোরাসানের উমাইয়া গভর্নর নাসর ইবনু সাইয়ার ১ হাজার তুর্কি দাস কিনে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে তাদের ঘোড়ায় চড়িয়ে দিয়েছিলেন।[১৬] মা-ওয়ারাউন নাহার (Transoxiana) ছিল তুর্কি দাসদের প্রধান উৎসস্থল।[১৭] আব্বাসিদের যুগে তুর্কি দাসদের সহযোগিতা সামরিক বিভাগ ছাড়িয়ে অন্যান্য বিভাগেও ছড়িয়ে পড়েছিল।[১৮] সে কালে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ, ককেশাস, কিপচাক, এশিয়া মাইনর, তুর্কিস্তান ও মা-ওয়ারাউন নাহারে দাস বেচাকেনার বাজার বসত। সে-সকল দাসের মধ্যে তুর্কি, সার্কাসিয়ান, রোমক, কুর্দি ও কিছু ইউরোপিয়ানও ছিল।[১৯] আব্বাসি খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ[২০] প্রথমে মামলুকদের দিয়ে একটি সামরিক ইউনিট গঠন করেন এবং তাদের পারসিক ও আরবদের স্থলাভিষিক্ত করেন। আর এরাই সেনাবাহিনীর তালিকা থেকে আরবদের নাম বিলুপ্ত করে দেয়।[২১]

খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর সেনাবাহিনীতে দাসের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বাগদাদ তাদের দ্বারা এমনভাবে ভরে গিয়েছিল যে, রাস্তায় মানুষের সঙ্গে তাদের ধাক্কা লেগে যেত। তাদের প্রভাবে বাগদাদবাসীরা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি তাদের

[১৬] *তারিখে তাবারি* : ৪৭।
[১৭] *তারিখু বাইতিল মাকদিস ফিল আসরিল মামলুকি* : ৪৭।
[১৮] প্রাগুক্ত; *তারিখুল মুগুল ওয়াল মামালিক* : ৬১।
[১৯] *তারিখুল মুগুল ওয়াল মামালিক* : ৬১।
[২০] খিলাফতকাল : ২১৮-২২৭ হিজরি—৮৩৩-৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ।
[২১] *তারিখু বাইতিল মাকদিস ফিল আসরিল মামলুকি* : ৪৭।

এবং অপরাপর তুর্কি দাস ও স্বাধীনশ্রেণির জন্য রাজধানী ও সেনা সদরদপ্তর হিসেবে সামাররা শহর নির্মাণ করেন।[২২] মুতাসিম বিল্লাহ পারস্য ও আরবের প্রভাব থেকে বাঁচতে সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তুর্কি দাস-সেনাদের দ্বারা সমান সহযোগিতা নিয়েছিলেন। তুর্কিদের প্রতি অগাধ আস্থার কারণেই তিনি বেচাকেনা, শিক্ষাদীক্ষা, সমরপ্রস্তুতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কেননা, তাদের মধ্যে পারসিকদের মতো এত লোভ ছিল না; আবার আরবদের মতো স্বজনপ্রীতি, গোত্রপ্রীতিও ছিল না।[২৩] এ মামলুক সেনাবাহিনী খুব দ্রুত রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করে নেয়। শেষপর্যন্ত এমন হয় যে, তারা যা চাইত তা-ই করতে পারত।[২৪] খলিফা মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ (মৃত্যু ২৪৭ হিজরি—৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের হাতে একপ্রকার বন্দি হয়ে ছিলেন। তারা ইচ্ছা করলে তাঁকে অপসারণ বা হত্যাও করতে পারত![২৫] এভাবেই এ মামলুকবাহিনী খলিফাদের বিদ্রোহী দলে পরিণত হয়ে ওঠে। তারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনৈতিক হস্তক্ষেপ শুরু করে। ফলে রাজধানীকেন্দ্রিক ক্ষমতা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। যেহেতু বাহিনী ও নেতৃত্ব তখন তাদেরই হাতে ছিল, তাই স্বভাবতই আব্বাসি খিলাফতে তুর্কিদের প্রভাব বেড়ে চলেছিল; খিলাফতের কর্তৃত্ব যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরের মনে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের বাসনা জেগে উঠতে থাকে। এতে তুর্কি সেনাবাহিনী ও এর প্রধানরা বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনে খলিফাদের অস্ত্রে পরিণত হয়। এভাবেই উসমানি শাসনামলে তুর্কি মামলুকদের কদর আরও বেড়ে যায় এবং তাদের অনেকেই গভর্নর, মন্ত্রী ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে।[২৬]

মূলত আব্বাসি খিলাফতের প্রথম যুগেই মামলুক শব্দটা মুসলমানদের কাছে বিশেষ এক পরিভাষায় পরিণত হয়। তখন দাসবাজার থেকে যে-সকল শ্বেতাঙ্গ দাস কিনে আনা হতো, তাদেরই মামলুক বলা হতো। তারা বিশেষ সামরিক বিভাগে কাজ করত। আব্বাসিদের দ্বিতীয় যুগে খিলাফত যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতই তুর্কি দাসদের প্রয়োজন বেড়ে যায়। খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ছোট ছোট রাজ্য যেমন : মিসরের তোলুনিয়া ও ইখশিদিয়া,[২৭] খোরাসানের সাফারিয়া ও সামানিয়া[২৮] এবং ভারতের গজনবি ও ঘুরি—সবাই নিজেদের রাজ্য শক্তিশালী করতে তুর্কি দাস

[২২] *কিয়ামু দাওলাতিল মামালিকিল উলা* : ১২।

[২৩] *তারিখুল মুগুল ওয়াল মামালিক* : ৬২।

[২৪] *কিতাবুর রাওজাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন; তারিখুল মুগুল ওয়াল মামালিক* : ৬২।

[২৫] *আল-ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়্যাহ* : ২২০।

[২৬] *তারিখুল মুগুল ওয়াল মামালিক* : ৬২।

[২৭] *আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ইতিবার; তারিখু বাইতিল মাকদিস* : ৮৪।

[২৮] *তারিখু ইরান বাদাল ইসলাম* : ৯৭-১৬৭।